দ্য ব্যাটেলস অব ইসলাম

মেজর জেনারেল (অব.)
সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক

মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক, ৪ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জানুয়ারি ১৯৭০-এ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমী কাকুলে যোগ দেন এবং সেপ্টেম্বর ১৯৭০-এ নিজ ব্যাচে প্রথম স্থান অধিকার করে কমিশন পান। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধ–দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ৩ নং সেক্টরের সঙ্গে। পরবর্তী দীর্ঘ চাকুরি জীবনে বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৮-৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক শান্তি প্রক্রিয়ায় অবদান পালনকারী একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে ডিএমও, বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীর কমান্ডান্ট ও যশোর অঞ্চলের জিওসি ছিলেন। ১৫ জুন ১৯৯৬-তে অবসরপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে তিনি ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ এর মহাপরিচালক ছিলেন। চাকুরি সংক্রান্ত কাজে পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের (১৯৬২-৬৮) একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ইন ডিফেন্স স্টাডিজ পাশ করেন। সামরিক লেখাপড়ার অঙ্গনে তিনি ইংল্যান্ডের

www.pathagar.com

বিশ্ববিখ্যাত 'দি রয়েল স্টাফ কলেজ কিম্বারলি' থেকে (১৯৮৩) পিএসসি ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'আর্মি ওয়ার কলেজ' থেকে (১৯৯০) এ ডব্লিউ সি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি 'সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড পীস স্টাডিজ' নামক বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি 'ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ এন্ড প্রোপাগেশন অব দি টিচিংস অব হযরত মুহাম্মদ (সা.)' [বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ইনস্টিটিউট]- এর প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন এবং টেলিভিশনে নিয়মিত বিভিন্ন টক-শো'তে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি একাধিক গ্রন্থের প্রণেতাও।

প্রচ্ছদ ▪ ধ্রুব এষ

www.pathagar.com

দ্য ব্যাটলস অব ইসলাম

www.pathagar.com

দ্য ব্যাটলস অব ইসলাম

মেজর জেনারেল (অব.)
সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক

গবেষণা সহকারী
রাব্বুল ইসলাম খান

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

www.pathagar.com

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ ❑ সুপার গ্রীন প্রেস
৬১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ দুইশত টাকা

ISBN 984 70105 0181 0

The Battles of Islam by Major General (Retd) Syed Muhammad Ibrahim, Bir Protik
Published By : Monirul Hoque, Anannya 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100,
First Published : February 2009, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 200.00 Taka Only

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22 Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Hights, N.Y. 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এ গ্রন্থের আলোচিত যুদ্ধগুলোতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন
তাঁদের পবিত্র আত্মার প্রতি সম্মানস্বরূপ

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাস একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাস এক গৌরবময় ইতিহাস। এ ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে আমাদের জন্য অনুকরণ করার মত শত শত, হাজার হাজার ঘটনা বা চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য যে ইসলাম আমাদের কাছে এসেছে, সে ইসলাম কিন্তু হঠাৎ করে একদিনে বাস্তবায়িত হয়নি। ধীরে ধীরে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এসেছে। এজন্য ত্যাগ করতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে, জীবন দিতে হয়েছে।

সেই ইসলামের ইতিহাসে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হওয়ার পেছনে কারণ ছিল, প্রেক্ষাপট ছিল। আর জাগতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকা মুসলিম বাহিনীর রক্ষণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এসব যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এসব বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর আলোচনা দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করার আয়োজন করেছিল ইসলামিক টেলিভিশন। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক হিসেবে তারা বেছে নিয়েছিল আমাকে। ২০০৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া 'ব্যাটল অব ইসলাম' নামের এ অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়েছিল ১৩টি পর্বে। অনুষ্ঠানটি দেশের মধ্যে এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সুবাদে দেশের বাইরে তথা বহির্বিশ্বেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ ইসলামের এ যুদ্ধগুলো এভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ বাংলাদেশের আর কোনো টেলিভিশন চ্যানেল এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। এজন্য ইসলামিক টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে বারবার ধন্যবাদ জানাতে হবে। দর্শক চাহিদার কারণে ইসলামিক টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ এই অনুষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যেই দ্বিতীয়বারের মত সম্প্রচার করেছে। এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত জানিয়ে টেলিভিশনের দর্শকগণ দেশের মধ্য থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও প্রচুর টেলিফোন করেছেন। অনেকেই বলেছেন, এ আলোচনাগুলো একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন, ছাত্র/ছাত্রীরা উপকৃত হবেন, শিক্ষকগণ উপকৃত হবেন, গবেষকগণ উপকৃত হবেন।

এসব কথা বিবেচনা করেই এ যুদ্ধের বর্ণনাগুলোকে একটি গ্রন্থে রূপ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হল। তবে প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি যে, পুরো গ্রন্থটিই উপস্থাপন করা

www.pathagar.com

হয়েছে খুব সাদামাটাভাবে, সাধারণ পাঠকদের জন্য। যেন এখান থেকে তারা ইসলামের যুদ্ধগুলো সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণ পেতে পারেন। আমি নিজেও উচ্চমানের গবেষক নই বা ইসলামী পণ্ডিত নয়। সাধারণ একজন সৈনিক এবং অভ্যাসরত মুসলমান। সেই হিসেবে এই লেখার আয়োজনও তাই সাধারণ মানুষের জন্য। অনুরোধ থাকবে খুটিনাটি বিষয়ে বিতর্কে না জড়িয়ে এ ধরণের গ্রন্থকে আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করার। যাঁরা উঁচু পর্যায়ের গবেষক, তাঁরা যদি আরও তথ্য এবং উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটিয়ে এ ধরণের আরও সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারেন তাহলে অনেকেই উপকৃত হবেন।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে রাব্বুল ইসলাম খান বড় ধরণের ভূমিকা পালন করেছেন। রাব্বুল ইসলাম খান নিজেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না। তবুও তিনি তার সীমাবদ্ধতা নিয়েই মানুষের মাঝে 'ইসলামের যুদ্ধগুলো সংক্রান্ত' জ্ঞান বা তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই এ কাজে জড়িয়েছিলেন। ব্যাটল অব ইসলাম অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনে প্রচারের পূর্বে তিনি যেমন পরিশ্রম করেছেন, বই আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি ধৈর্য সহকারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এ জন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

টেলিভিশনে 'ব্যাটল অব ইসলাম' উপস্থাপন করতে গিয়ে এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা পবিত্র কোরআন এবং হাদীস থেকে যেমন তথ্য নিয়েছি, তেমনি ইতিহাস গ্রন্থ থেকেও সাহায্য নিয়েছি। স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আলোচনা করতে গিয়ে চেষ্টা করেছি সতর্কতা অবলম্বন করার। তারপরেও যদি কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে থাকে, সে ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক
০১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বদরের যুদ্ধ / ১১

ওহুদের যুদ্ধ / ২২

খন্দকের যুদ্ধ / ৩১

খয়বরের যুদ্ধ / ৪২

মু'তার যুদ্ধ / ৫১

মক্কা বিজয় / ৫৯

হুনায়েন এবং তায়েফের যুদ্ধ / ৭০

তাবুকের যুদ্ধ / ৮৩

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) শাসনামলের যুদ্ধ / ৯৬

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফরুক (রা.) শাসনামলের যুদ্ধ / ১০৯

কারবালার যুদ্ধ বা ঘটনা / ১২৯

স্পেন বিজয় / ১৪০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বদরের যুদ্ধ

ভূমিকাঃ

পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে, বদরের যুদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম। ইতিহাসে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধ হল তার মধ্যে অন্যতম। মুসলমানদের জন্য এ যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এটি ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। যে যুদ্ধে মহানবী (সা.) সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেছিলেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবের এই দোয়া কবুল করে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে জয়ী করিয়ে দিয়ে ইসলামের প্রচার, প্রসার আর অগ্রযাত্রার ভিত রচনা করে দিয়েছিলেন মহান আল্লাহ তায়ালা এই বদরের যুদ্ধে।

বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় সালে রমজান মাসে ১৭ তারিখে এবং এই যুদ্ধের স্থান ছিল বদর নামক জায়গায়। তাই এ যুদ্ধের নাম বদরের যুদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসের এই প্রথম যুদ্ধ খুব অসমান একটা যুদ্ধ ছিল। এক পক্ষে মুসলমানগণ এবং এক পক্ষে মক্কাভিত্তিক অমুসলমান, কোরাইশগন বা বিধর্মীগণ। মুখবন্ধে বলা কথাটা আরেকবার বলছি। এখানে যে আলোচনা হবে তার ভিত্তি হচ্ছে প্রকাশিত ইতিহাসে যা লেখা আছে তাই। সঙ্গে চেষ্টা করেছি পবিত্র কুরআনের তাফসীর থেকে সাহায্য নিতে। একাধিক তাফসীর আমরা ঘেঁটেছি, তবে যেটি সবচেয়ে বেশি ঘেঁটেছি সেটি হল মারেফুল কুরআন যেটি মুফতি শফি লিখেছেন। তার বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে মাওলানা মহিউদ্দীন খান কর্তৃক। আমি অনুরোধ করব গবেষকগণকে একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার জন্য। কারণ, আমরা এটাকে লিখছি সাদামাটাভাবে। নিখুতভাবে নয়, যেন লেখাপড়ার সকল স্তরের মানুষের জন্যই অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহজ হয়, সকলেই মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারেন। রাসুল পাক (সা.) এর প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা, প্রেম এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আনুগত্য, প্রেম, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে যদি আমরা জানি যে, আমাদের দ্বীন ইসলাম কী নিয়মে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি যুদ্ধের তৎকালীন আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে একটু পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য একটি/দু'টি নকশা বা ম্যাপ উপস্থাপন করেছি। তবে ম্যাপগুলো ফ্রি হ্যান্ড স্ক্যাচ বা সাদামাটাভাবে আঁকা হয়েছে, কোনো মাপুনি ছাড়া।

www.pathagar.com

যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা:

বদরের যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা কেন ছিল? বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট কী? সে বিষয়গুলো অবশ্যই প্রথমে আলোচনা করে নিতে হবে। প্রিয় পাঠক আপনারা খেয়াল করুন যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পর ১৩ বছর রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় ছিলেন। অত:পর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে, পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিনি হিজরত করেন। তিনি মদীনা নামক শহরে চলে যান। মক্কায় তিনি ছিলেন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে এবং আচরণে, আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে এবং আচরণে। মদীনায় যাওয়ার পর সেখাতে তিনি উন্মুক্ত পরিবেশ পেলেন, উন্মুক্ত জনপদ পেলেন। মদীনাবাসী তাঁকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু মক্কার লোককে যদি বলা হত যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)কে মদীনায় যেতে দেবে কিনা? তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারা যেতে দিত না। কিন্তু যখন তিনি সফলভাবে চলে গেলেন তখন ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করার জন্য মক্কার কোরাইশগণ যত রকমের চেষ্টা করেছিল সেটা তখন বিফল হয়ে গেল। এখন তারা নতুনভাবে চেষ্টা শুরু করল যে মদীনাভিত্তিক কোনো মুসলিম সমাজ বা মুসলমান জনগোষ্ঠী, কোনো মুসলমান সভ্যতা, মুসলমান ক্ষমতার কেন্দ্র যেন গড়ে না ওঠে। অপরপক্ষে মদীনায় যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) স্থির করলেন যে, মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাজ্য যদি গড়ে তুলতে হয় তার কেন্দ্র হবে মদীনা। পারস্পরিকভাবে বিপরীতমুখী দুইটি আকাঙ্ক্ষা। মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা মদীনাকে সুরক্ষিত করা, মদীনাকে বিকশিত করা, আর কোরাইশদের আকাঙ্ক্ষা মদীনাকে ধবংস করা, মুসলমানদেরকে ধবংস করা। এরকম অবস্থায় প্রায় এক বছর কেটে গেল।

এক বছর পর পরিস্থিতি একটু ভিন্ন মোড় নিল। এক বছরে মদীনা কিছুটা সুসংহত হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। মক্কা থেকে লোকজন গিয়ে মদীনার মুসলমানদেরকে উৎপীড়ন করতো বা ডিসটার্ব করতো, খোচাখুচি করতো। এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন ছিল। অপরপক্ষে মদীনা নামক নতুন রাষ্ট্র যার গোড়াপত্তন রাসুলুল্লাহ (সা.) করলেন, সেই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তখনও শক্ত হয়নি, তাদের হাতে তত অস্ত্র-শস্ত্র নেই, তাদের টাকা পয়সা কম, এগুলো সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল। তাই এ সময় একটা সিদ্ধান্ত হল যে, মুসলমানগণ অস্ত্র সংগ্রহ করবেন, নিজেদের আত্মরক্ষার প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করবেন। এই প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় হিজরীতে সিদ্ধান্ত হল যে, মক্কাবাসীদের কোনো বাণিজ্য কাফেলাকে যদি আমরা দখল করতে পারি তাহলে তাদের অনেক সম্পদ আমরা পাবো। এখানে বলে নিতে হবে যে, কোরাইশদের সওদাগরী কাফেলা বহরের ওপরে মুসলমানরা যে আক্রমণ চালাতে পরিকল্পনা করলো সেটাকে সাধারণ লুটপাট বলে মনে করা ঠিক হবে না। কারণ, কোরাইশরা যেমন নিরপরাধ ছিল না, তেমনি মুসলমান আক্রমণকারীরাও

www.pathagar.com

কোনো গোপন দস্যু দল ছিল না। বরং এই দু'টি নগর রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। আর যুদ্ধাবস্থায় শত্রুর জান-মাল বা অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষতি সাধন করার অধিকার থাকে। তাই মুসলমানরা পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু মক্কাবাসীর বাণিজ্য কাফেলাগুলো যখন মক্কা থেকে সিরিয়া যাতায়াত করতো এবং আবার ফেরত আসতো, তখন তারা কখনও একা যেত না। তারা সবসময় যেত স্কট নিয়ে বা পাহারাদার নিয়ে। এ জন্য ঐ বাণিজ্য কাফেলা, কী রকম পাহারাদার নিয়ে যায় সেটা পরিদর্শন করার বা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হল। তাই মহানবী (সা.) দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে একটি পদক্ষেপ নিলেন। তিনি একজন সাহাবীর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি পর্যবেক্ষণ দল মক্কার নিকবর্তী 'নাখলা' (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান) নামক স্থানে পাঠালেন। সেই পর্যবেক্ষণ দলের প্রধান ছিলেন একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস (রা.)। তখনকার দিনে আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী ১২টি মাসের মধ্যে ৪টি মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। তার মধ্যে চতুর্থ মাস ছিল রজব। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল যে, তোমরা পর্যবেক্ষণ করবে কীরকম বাণিজ্য কাফেলা বের হয়, তাদের কীরকম পাহারাদার থাকে এবং তাদেরকে কোন জায়গায় বা কখন কীভাবে আক্রমণ করলে সুবিধা। মক্কায় থাকা অবস্থায় ঘটনাক্রমে এই চার সদস্যের একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে এই পর্যবেক্ষণকারী দলের সংঘাত হল। সেই সংঘাতের ফলে ৪ জনের মধ্যে ১ জন মারা গেল, ২ জন বন্দী হল এবং ১ জন পালিয়ে গেল। দু'জন বন্দীকে নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস (রা.) উনার দলবল নিয়ে মদীনায় ফেরত আসলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) দৃশ্যত একটু নাখোশ হলেন। তিনি মনে মনে বললেন যে, রজব মাসে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ, সুতরাং এ মাসে কেন সংঘর্ষ হল? আল্লাহ নারাজ হবেন। আর কোরাইশদের জন্য এ ঘটনাটি প্রচার করা খুব সুবিধা হল। তারা কঠোর অভিযোগ উত্থাপন করে প্রচার করতে লাগলো। তারা বলল, ওদের অবস্থা দেখ! ওরা হারাম মাসেও রক্তপাত ঘটাতে দ্বিধা করে না! এসব অভিযোগের উত্তরে পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ২১৭ নম্বর আয়াত নাজিল হল। বলা হল, *"ইয়াছআলূনাকা আনিশ্শাহরিল হারা-মি ক্বিতা-লিন ফীহ; কুল ক্বিতা-লুন ফীহি কাবীর; অ ছাদ্দুন আন ছাবীলিল্লাহি অ কুফরুন্বিহী অল মাছজিদিল হারামি অ ইখরা-জু আহলিহী মিনহু আকবারু ইন্দাল্লাহ, অল ফিত্নাতু আকবারু মিনাল ক্বাতল; অলা-ইয়াযালুনা ইউক্বাতিলুনাকুম হাত্তা ইয়ারুদ্দুকুম আন দীনিকুম ইনিস্তাতাউ; ওয়া মাইইয়ারতাদিদ মিনকুম আন দীনিহী ফাইয়ামুত ওয়া হুয়া কাফিরুন ফা উলা--ইয়া হাবিত্বাত আ'মা লুহুম ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ, ওয়া উলা--ইকা আছহাবুন্নার, হুম ফীহা খালিদুন" অর্থাৎ* "লোকেরা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, উত্তরে বলে দাও–এই মাসে লড়াই করা বড়ই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর নিকট তার থেকেও বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখা,

www.pathagar.com

আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য "মসজিদে হারাম" এর পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা। আর ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম; তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে রাখবে, যে পর্যন্ত না তোমাদের ধর্মচ্যুত করতে সমর্থ হবে; তোমাদের মধ্য থেকে যে দ্বীন ত্যাগ করে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। ওরা দোজখবাসী এবং অবস্থান করবে সেখানে চিরকাল।" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঐ ঘটনার অনুমোদন দেয়া হল। এটিকে বলা যায় ঘটনাত্তোর অনুমোদন। এখানে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের মনে স্বস্তি দিলেন, শান্তি দিলেন যে, না তোমরা যা করেছ ঠিক করেছ, এটা করার প্রয়োজন ছিল।

এভাবে বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে সম্পদগুলো আহরণ করতে চাইলেও ঘটনা কিন্তু অন্যরকম হয়ে যায়। ঘটনা এমন হয় যে, আবু সুফিয়ান নামক বিখ্যাত ব্যক্তির নেতৃত্বে যে বাণিজ্য কাফেলাটি আসছিল, সেই কাফেলা যে কোনো নিয়মে খবর পেয়ে যায় যে, মদীনা থেকে মুসলমানদের একটি দল বের হয়েছে এবং বাণিজ্য কাফেলা বিপদে পড়তে পারে। তাই আবু সুফিয়ান মক্কাতে খবর পাঠিয়ে দেয় যে, আমাদের পাহারাদর কম, আমরা পারবো না, আমাদের সাহাযার্থে মক্কা থেকে বড় সৈন্য দল পাঠানো হোক। তাহলে দু'টি কাজ একসঙ্গে হচ্ছিল কোরাইশদের পক্ষে। এক. কোরাইশগণ বা মক্কাবাসীর বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে আসছিল, দুই. সেই বাণিজ্য কাফেলা থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে মক্কা থেকে আরেকটি সৈন্য বাহিনী উত্তর দিকে যাচ্ছিল, যাতে বাণিজ্য কাফেলাকে তারা এগিয়ে আনতে পারে বা স্বাগত জানিয়ে পাহারা দিয়ে ফেরত আনতে পারে। মুসলমানদের পক্ষে একটি কাজ হচ্ছিল, তারা একটি দল নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়েছেন বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে সম্পদগুলো নেয়ার জন্য এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রাখতে হবে যে, সম্পদের মধ্যে বহু অস্ত্র ছিল। আর এই অস্ত্রগুলো যদি মক্কাবাসীদের হাতে যায় তাহলে মক্কা খুব শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং সেটা মদীনাবাসীদের জন্য তথা নতুন মুসলমান রাষ্ট্রের জন্য বিপদের কারণ হবে। তাই এই বাণিজ্য কাফেলা থেকে সম্পদ আহরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এই প্রেক্ষাপটে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কিভাবে এবং কোন জায়গায় অবস্থান নিবেন। কিন্তু বাণিজ্য কাফেলা ঘটনাক্রমে সফল হল। তারা মুসলিম বাহিনীর চোখ এড়িয়ে মক্কার দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। ওদিকে মক্কা থেকে আগত বৃহৎ আকারের সৈন্য বাহিনী বাণিজ্য কাফেলাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসে বাণিজ্য কাফেলার কাছাকাছি না গিয়ে বদর নামক স্থানে এসে পড়লো মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য। আবু সুফিয়ান যখন নিরাপদে মক্কায় যেতে পারলো তখন সে মক্কা থেকে আগত সৈন্যদেরকে খবর পাঠালো যে,

www.pathagar.com

তোমরা ফিরে যাও, কাফেলা আক্রান্ত হবার কোনো আশংকা নেই। এ খবর পেয়ে সৈন্যদের কেউ কেউ ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেও আবু জেহেল রুখে দাঁড়ালো। সে অহংকারের সাথে বলল, খোদার কসম, বদর প্রান্তরে তিনদিন অবস্থান না করে আমরা ফিরবো না। সমগ্র আরবে আমাদের এই অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং চিরকালের জন্য আমাদের এই অভিযানের বিবরণী উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত, সেই সময় নিয়ম ছিল যে, কোনো কওম অন্য কোনো কওমের উপর জয়ী হলে বিজয়ীরা তিনদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাটাতো। তাই আবু জেহেল বদর প্রান্তরে তিনদিন অবস্থান নেয়ার কথা উল্লেখ করেছিল।

এদিকে মহানবী (সা.) দূতের মাধ্যমে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বুঝতে পারলেন যে, কোরাইশদের সাথে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এখানে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মক্কার বাহিনীকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিলে পরিণাম ভালো হবে না, তারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। অন্যদিকে মুসলমানদের আওয়াজ দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তাই মুসলমানরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে শক্ত হলেন। যদিও মুসলমানগণ বারবার চিন্তা করছিলেন যে, আমাদের সামনে দু'টি লক্ষ্যবস্তু আছে। তারা বের হয়েছেন বাণিজ্য কাফেলাকে সংঘাতের মধ্যে এনে তাদের সম্পত্তি নেয়ার জন্য কিন্তু তারা আবার এটিও জানতে পারলেন যে, তাদের বিরুদ্ধে একটি বড় সৈন্য দল আসছে। সে সময় মুসলমানগণ কামনা করছিলেন যে, যুদ্ধ এড়িয়ে সহজ টার্গেট হচ্ছে বাণিজ্য কাফেলা, সেটা নিয়ন্ত্রণে নেয়া। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একটি আয়াতের মাধ্যমে জানালেন যে, *"কুতিবা আলাইকুমূল ক্বিতালু ওয়া হুম কুরহুল্লাকুম ওয়া আছা—আন তাকরাহু শাইআউঁ ওয়া হুয়া খাইরুল্লাকুম ওয়া আছা—আন তুহিব্বু শাইআউঁ ওয়া হুম শারুল্লাকুম; ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা তা'লামুন"* অর্থাৎ জিহাদের বিধান প্রবর্তন হল, যদিও তোমাদের কাছে অসহ্য বা অপ্রীতিকর মনে হচ্ছে। হতে পারে তোমরা যেটাকে অকল্যাণকর মনে করছ সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর আবার যেটাকে তোমরা কল্যাণকর মনে করছ সেটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। (সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২১৬) এই বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে অন্যান্য সব বিষয়ই বিস্তারিতভাবে কোরআনে রয়েছে যে, কিভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং কিভাবে বিজয় এসেছে। এটা খুব Well documented history.

এরপরেই সুরা আন ফাল এর ৪৫ নম্বর আয়াতে এ যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে *"ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু—ইজা লাক্বীতুম ফিআতান ফাছতুবু ওয়াজকুরুল্লাহা কাছিরাল লা'আল্লাকুম তুফলিহুন"।* অর্থাৎ 'হে ঈমানদার লোকেরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে তোমাদের প্রত্যক্ষ মোকাবিলা হয় তখন দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থাক এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর। আশা আছে যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনীর অবস্থান এবং সৈন্য সংখ্যাঃ

মুসলমান বাহিনী যেখানে অবস্থান নিলেন সেখানে একটি পানির কুপ ছিল। মরুভূমিতে পানির কূপ কম পাওয়া যায়। মুসলমানগণ পানির কূপটি দখল করে ফেলল আগে। ওখানেই একটি পাহাড়ের উপরে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জন্য একটি তাবু গেড়ে দেয়া হল। এটিই হল মুসলমানদের হেড কোয়ার্টার। এই তাবুর বাইরে শুধু আবু বকর (রা.) থাকলেন আর বাকী সকলেই একটু দূরে সরে আসলেন। পরের দিন যখন মক্কার বাহিনী এলো তারা দেখলো যে কূপটি দলখ হয়ে গিয়েছে। অগত্য তারা তার উল্টো দিকে অবস্থান নিল। পুরো এলাকাটাই ছিল পাহাড়ী এলাকা। তবে ছোট পাহাড়, খুব বেশি উঁচু পাহাড় নয়।

বদরের যুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের সংখ্যা এবং মুসলমানদের সৈন্যের সংখ্যা আমরা অনেকেই জানি। এই অসম যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। অন্যদিকে কোরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,০০০। মুসলমানদের এই সৈন্যদের মধ্যে ৮৫ জন ছিলেন মোহাজের সাহাবী। বাকি সকলেই ছিলেন মদীনার আনসার। আনসারদের মধ্যে ৬১ জন আওস এবং ৭০ জন খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পুরো ৩১৩ জন সৈন্যের দলে উট ছিল ৭০টি আর ঘোড়া ছিল মাত্র ২ টি। অপরপক্ষে তাদের ১,০০০ সৈন্যের মধ্যে ৬০০ জনের কাছে ছিল দেহ রক্ষাকারী বর্ম। তাদের ঘোড়া ছিল ২০০টি।

উভয় সৈন্যের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য, যুদ্ধ এবং আল্লাহর সাহায্যঃ

মুসলমানগণ যেখনে অবস্থান নিয়েছেন সেখানে দিনের বেলা সূর্য তাদের মুখে পড়ে কিন্তু কোরাইশ বাহিনীর মুখে দিনে সূর্য পড়ে না। এরপর মুসলমানগণ যেখানে অবস্থান নিয়েছেন সেখানকার মাটি একটু নরম, ঘোড়া বা উট দৌড়ানোর জন্য উপযুক্ত না, অপরপক্ষে মক্কার বাহিনী যেখানে অবস্থান নিয়েছে সেখানকার মাটি শক্ত। ঘোড়া, উট, মানুষ দৌড়ানোর জন্য উপযুক্ত। অবস্থান নেয়ার পর কি হল? মনে করুন আমরা সেই রাত্রিতে সেখানে আছি। ১৬ রমজান দিন শেষ, মাগরিবের পর তারিখ বদল হয়ে হল ১৭ই রমজান। এখানে মাগরিবের পর থেকে সকাল পর্যন্ত কি হচ্ছে? রাসূলে পাক (সা.) সিজদায় আছেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো সেটি পূরণ কর। ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি, তুমি সাহায্য কর। আগামীকালের যুদ্ধ নীতি নির্ধারক যুদ্ধ। সিদ্ধান্ত প্রবর্তনকারী যুদ্ধ। ইসলাম পৃথিবীতে থাকবে কি থাকবে না, তোমার প্রতি সিজদা হবে কি হবে না, সেটা নির্ধারণ হবে আগামীকালের যুদ্ধে। তুমি সাহায্য করলে মুসলমানরা জয়ী হবে। তা না হলে ৩১৩ জন নিয়ে ১০০০ জনের বিরুদ্ধে আমরা

www.pathagar.com

পারবো না। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কান্নাকাটিতে, আবেগে, ভালোবাসায় আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে সুসংবাদ দিলেন যে, সাহায্য আসবে। সূরা আনফাল এর ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বললেন, *"ইজ তাস্তাগীছুনা রাব্বাকুম ফাস্তাজ্বা বালাকুম আন্নী মুমিদ্দুকুম বিআলফিম মিনাল মালা--য়িকাতি মুরদিফীন।* অর্থাৎ আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এ ফরিয়াদ কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে (এ যুদ্দের ময়দানে) পরপর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, আরবের মরুভূমিতে সচরাচর বৃষ্টি হয় না। ঐ রাতে বৃষ্টি হল। আবার মরুভূমিতে বিস্তির্ণ এলাকা নিয়ে বৃষ্টি হয় না, লোকালাইজড বা স্থানীয়ভাবে বৃষ্টি হয়। ঐ রাতে স্থানীয়ভাবে বৃষ্টি হল। বৃষ্টির কারণে কি কি ফল হল দেখুন। বৃষ্টির কারণে মুসলমানদের এলাকাটিতে নরম মাটি বৃষ্টির পানি পেয়ে কমপ্যাক্ট (Compact) বা শক্ত হয়ে গেল। অপরপক্ষে কোরাইশ বাহিনী যেদিকে ছিল সেখানকার শক্ত মাটি বৃষ্টির পানি চুষতে পারেনি বলে মাটিটি পিছলা হয়ে গেল। মুসলমানদের ঘোড়া, উট এবং মানুষ চলাচলের জন্য উপযুক্ত হয়ে গেল কিন্তু কোরাইশদের এলাকাটি ঘোড়া, উট আর মানুষের চলাচল বা দৌড়াদৌড়ি করার জন্য অনুপোযুক্ত হয়ে গেল। এছাড়া রাতে যেহেতু বৃষ্টির কারণে আবহাওয়া শীতল হল, তাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মুসলমানগণ তাদের শিবিরে ভালোমত ঘুমিয়ে পড়ল। অর্থাৎ কয়েক রাত্রি ঘুম ছাড়া কাটানোর পর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মুসলিম বাহিনী, চিন্তাক্লিষ্ট মুসলিম বাহিনীর ভালো ঘুম হল। পরের দিন সকালে যখন তারা ঘুম থেকে উঠলো তখন তারা পরিচ্ছন্ন বা ক্লান্তিমুক্ত অবস্থায় উঠলো। এই অবস্থায় যুদ্ধ শুরু হয় ১৭ তারিখে।

সেই যুদ্ধে তৎকালীন প্রথা মোতাবেক কোরাইশরা প্রথমে বলল যে, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তিনজনকে পাঠাচ্ছি, এই তিনজনকে মোকাবিলা করার জন্য তোমরা তিন জন পাঠাও। কোরাইশদের পক্ষ থেকে আকাবা নামক ব্যক্তির নেতৃত্বে তিনজন এগিয়ে এলো। এই তিনজনের মধ্যে আকাবা নিজে একজন এবং আরেকজন ছিল তারই এক ছেলে। লক্ষণীয় বিষয় হল, আকাবার আরেক ছেলে মুসলমান হয়েছিল। তাই সে এসেছিল মহানবী (সা.) এর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে। সে এগিয়ে এসে বললেন, আমি আমার পিতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। এখানে খেয়াল করতে হবে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কতটুকু সচেতন ছিলেন এবং কত দয়া পরবশ ছিলেন। তিনি বললেন যে, না সন্তানকে আমি পিতার মুখোমুখি হতে দিব না। তিনি অন্য তিনজনকে হুকুম দিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আলী (রা.) এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চাচা হযরত হামজা (রা.)। লাইন থেকে তিনজন মুসলমান এগিয়ে এলেন, তিনজন কোরাইশ এগিয়ে এলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

যুদ্ধ করতে গিয়ে কোরাইশ তিনজনই নিহত হল। তিনজন মুসলমান বিজয়ী হলেন। তখনকার দিনের প্রথা মোতাবেক এরাও উন্মুক্ত মাঠে আসলো, ওরাও উন্মুক্ত মাঠে আসলো। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ৩১৩ জন একদিকে, ১০০০ জন একদিকে। অনেক উট একদিকে, অল্প উট একদিকে। অনেক ঘোড়া একদিকে, অল্প ঘোড়া একদিকে। এই সময় যা ঘটার ঘটে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করলেন। আল্লাহর রাসুল তাঁর তাবু থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে সামনে অগ্রসর হতে হতে বলছিলেন, অতি শীঘ্রই এই বাহিনী পরিজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে। যে কথাটি সুরা আল কামার এর ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। এ সময় মহানবী (সা.) এক মুঠ ধূলি নিয়ে কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করে বললেন, 'শাহতিল উজুহ' অর্থাৎ ওদের চেহারা আচ্ছন্ন হোক। সাথে সাথে এই নিক্ষিপ্ত ধূলা কাফিরদের চোখ, মুখ, নাক ও গলায় প্রবেশ করলো। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন যে, *"ফালাম তাক্বতুলুহুম ওয়ালা কিন্নাল্লাহা ক্বাতালাহুম ওয়ামা রামাইতা ইজ রামাইতা ওয়ালা কিন্নাললাহা রামা, ওয়ালি ইয়ুবলিয়াল মু'মিনীনা মিনহু বালা--আন হাছানা; ইন্নাল্লাহা ছামীউন আলীম।"* অর্থাৎ অতএব সত্য কথা এই যে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর বালু তুমি নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন (আর এ কাজে মু'মিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছে) এ জন্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা মু'মিনদেরকে এক সুন্দরতম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন ও জানেন। এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, ধূলি মুঠো হাত ছিল রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কিন্তু কাফিরদের প্রতি এই আঘাত ছিল আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে।

যুদ্ধের পরে সাহাবীগণ সাক্ষী দিয়েছেন যে, তাদের সঙ্গে আরও অনেকে অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করেছেন এবং কিভাবে যেন শত্রু ধ্বংস হচ্ছে সাহাবীরা সকলে সেটা বুঝে উঠতে পারেননি। এ ব্যাপারে বোখারী শরীফেও একটি হাদীস রয়েছে। বলা হয়েছে, সাহাবীরা বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সাদা পোশাকধারী এমন কিছু অপরিচিত সৈন্যকে দেখেছি, যারা আমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছে। অথচ তাদেরকে যুদ্ধের আগেও কখনও দেখিনি আবার যুদ্ধের পরেও কখনও দেখিনি। অর্থাৎ তারা ছিলেন আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত সম্মানিত ফেরেশতা। এই যুদ্ধে তাদের বিখ্যাত নেতা আবু জেহেল নিহত হল। এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোরাইশ বাহিনী হতদ্যম হল, মনোবলহারা হল, বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়ে ভেগে গেল। তারা ভেগে যাওয়ার পর মুসলমান বাহিনী তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদগুলো আহরণের জন্য সচেষ্ট হল। যেটাকে ইংরেজীতে বলে ওয়ার বুটি বা বাংলায় গণিমতের মাল। যুদ্ধ চলাকালে আরও ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে। পর্যবেক্ষণ করার

www.pathagar.com

জন্য উভয় পক্ষ বারবার চেষ্টা করেছে। শত্রুপক্ষের দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে ৩১৩ জনকে কখনই ৩১৩ জন মনে হয়নি। মনে হয়েছে কম। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে অনেকটা এরকমভাবে— আরে এত অল্প সংখ্যক সৈন্য, ওদেরকে সকাল বেলা উঠে এক থাপ্পড় দিলে উড়ে যাবে। অপরপক্ষে শত্রুপক্ষ অর্থাৎ কোরাইশদেরকে যখন মুসলমানরা দেখেছেন তাদেরকেও ১০০০ মনে হয়নি। অনেক কম মনে হয়েছে। লক্ষ্যণীয় হল, ওদের ১০০০ জনকে যদি ১০০০-ই মনে হত বা বেশি মনে হত তাহলে হয়তোবা মুসলমানদের মনে একটা ভয় আসতো, শংকা আসতো যে, এতবড় বাহিনীর সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধ করব? আল্লাহ তাই ইচ্ছে করেই তাদের আকার ছোট দেখিয়েছেন। আবার ওদেরকেও মুসলমানদের সংখ্যা আরও কম দেখিয়েছেন। তাই কোরাইশরা ওভার কনফিডেন্স বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেল। আর মুসলমানগণ নিজেদের বিশ্বাসকে ফিরে পেল যে, না সামনে ছোট বাহিনী। এদের সাথে যুদ্ধ করা সঙ্গত।

যুদ্ধের ফলাফল:

যুদ্ধ দুপুরের আগেই শেষ হয়ে যায়। যেটা মুসলমানগণ ভেবেছিলেন যে সারাদিন চলবে। যুদ্ধ শুরু হবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই অমুসলিম বাহিনীতে ব্যর্থতা ও হতাশার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। কাফের কোরাইশরা পেছনে হেঁটতে শুরু করল। তাদের মনে হতাশা ছেয়ে গেল। মুসলমান সৈন্যরা কাউকে হত্যা করছিলেন, কাউকে যখম করছিলেন, কাউকে ধরে নিয়ে আসছিলেন। ফলে তাদের পরাজয় সুস্পষ্ট হয়ে গেল। সেদিন হতাহতের মধ্যে ৭০ জন কোরাইশ বাহিনী নিহত হয় এবং ৭০ জন কোরাইশ বাহিনীর সদস্য বন্দী হয়। মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হয়েছিলেন ১৪ জন। তার মধ্যে ৬ জন ছিলেন মোহাজের সাহাবা এবং ৮ জন ছিলেন আনসার সাহাবা। সেদিনের অস্ত্র ছিল তরবারি, সেদিনের অস্ত্র ছিল বল্লম, সেদিনের অস্ত্র ছিল কিছু তীর। এই হল বদরের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এ পর্যায়ে আমরা ভাবতে পারি আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বদরের যুদ্ধে কতটুকু সাহায্য করেছিলেন এবং কীভাবে সাহায্য করেছিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো আমরা সচরাচর বলি আল্লাহর উপর নির্ভর করে চল। আমরা বলি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। এর মানে কি? মুসলমানদের যে কোনো কাজের জন্য নির্ভর করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাহায্যের উপর এবং তাওয়াক্কুলের মানে হচ্ছে তোমার প্রস্তুতি তুমি পূর্ণভাবে গ্রহণ কর কিন্তু প্রস্তুতির উপরে সাফল্যের জন্য নির্ভর করো না। সেই প্রস্তুতিকে যদি আল্লাহ কবুল করেন তাহলে তিনি সাফল্য দেবেন। এই হল তাওয়াক্কুল। বদরের যুদ্ধ হচ্ছে

www.pathagar.com

অতি উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ যে, কাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল।

বদরের যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে কী কী ধরণের সাহায্য ছিল সেটা সংক্ষেপে আমরা এভাবে বলতে পারি যে, বদরের যুদ্ধ শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সার্বিকভাবেই ছিল আল্লাহ পক্ষ থেকে ব্যাপক সাহায্য ও রহমতের বাস্তব নিদর্শন। আল্লাহপাক বলেছিলেন যে, তিনি সাহায্য করবেন এবং বাস্তবে তিনি সাহায্য করে মুসলমানগণকে যুদ্ধে জয়ী করেন। সাধারণত জাগতিক বিশ্লেষণে ৩১৩ জনের মিশ্রিত পেশার দুর্বলভাবে সজ্জিত অপ্রস্তুত একটি দল কোনোমতেই ১০০০ জনের মোটামুটি অভিজ্ঞ যোদ্ধার সুসজ্জিত একটি দলকে পরাজিত করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর রহমতে এবং সাহায্যে। যেমন:

ক) ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) কর্তৃক মহানবী (সা.)কে যুদ্ধদলের বিন্যাস প্রদর্শন বা ইঙ্গিত।

খ) যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে মহানবী (সা.)কে স্বপ্নে শত্রুর সংখ্যা কম দেখানো

গ) রাত্রি বেলা বৃষ্টি

ঘ) রাত্রি বেলা মুসলিম সৈন্যদের গভীর নিদ্রা

ঙ) যুদ্ধ চলাকালে বালু নিক্ষেপ

চ) উভয় পক্ষের সৈন্যগণের দৃষ্টিতে বিপরীত পক্ষের সৈন্য সংখ্যা কম মনে হওয়া

ছ) ফেরেশতাগনের সক্রিয় উপস্থিতি

ইবলিসের পালিয়ে যাওয়া:

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ যেমন মুসলমানদেরকে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তেমনি কাফিরদের পক্ষে অভিশপ্ত ইবলিসও এসেছিল ছোরাকা নামক এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখে সে ছুটে পালাতে লাগলো। মুশরিকরা বলল, ছোরাকা কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বলনি যে, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করবে, আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে না? ইবলিস (ছদ্মবেশী ছোরাকা) বলল, আমি এখন এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা। আল্লাহকে আমার ভয় হচ্ছে, তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। এরপর ইবলিশ সমুদ্রে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল।

শিক্ষনীয় বিষয় এবং উপসংহার:

মুসলমানদের জন্য এটিই ছিল প্রথম সমন্বিত এবং যতটুকু সম্ভব পরিকল্পিত যুদ্ধ। যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেকগুলো শিক্ষা পুন: নিশ্চিত হয়। যথা যুদ্ধের ময়দানে সুবিধাজনক

www.pathagar.com

অবস্থান নেয়া, পানীয় উৎস নিয়ন্ত্রণে রাখা, সূর্যের কথা খেয়াল রেখে সৈন্যদলকে দাঁড় করানো এবং যুদ্ধের আগে শত্রুদলের চতুর্পাশে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা। সবচেয়ে বড় শিক্ষনীয় বিষয় ছিল অজাগতিক তথা সকল কিছুর জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। তাওয়াক্কুলের সংক্ষিপ্ততম ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে আমি আবার বলছি যে, নিজেদের দ্বারা সম্ভব সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে কিন্তু সাফল্যের জন্য সেই প্রস্তুতির উপর নির্ভর করা যাবে না। নির্ভর করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী না হলে কী হতে পারতো সেটা কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তায়ালার অনেক দয়া, অনেক মেহেরবানী, তিনি রাহমানুর রাহিম, তিনি মুসলমানদের অগ্রযাত্রার ভিত্তি রচনা করলেন বদরের যুদ্ধে। একজন ব্যক্তির প্রচারিত ইসলাম এবং ঐ একজন ব্যক্তির সহযোগিতায় আরও কয়েকজনের প্রচেষ্টার ফলে মদীনার ইসলাম পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার পেছনে বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব সারাজীবনের জন্যই অপরিসীম।

www.pathagar.com

ওহুদের যুদ্ধ

ভূমিকা:

ইসলামের ইতিহাসে যতগুলো মর্মস্পর্শী, হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে অন্যতম ওহুদের যুদ্ধ। ওহুদের যুদ্ধের আলোচনা করতে গেলে রাসুলে পাক (সা.) এবং তাঁর প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণের নাম বা কর্মকা ে র আলোচনা বারবার আসবে। আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে আমরা যেন তাদের সমালোচনা না করি। এটি একটি শিক্ষামূলক আলোচনা। রাসলুল্লাহ (সা.) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সমালোচনা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

ওহুদের যুদ্ধের নাম এজন্য হয়েছে যে, বর্তমান মদীনা শহর যেখানে ঠিক সেখান থেকে আনুমানিক পাঁচ মাইল দূরে উত্তরে ওহুদ পর্বতমালা অবস্থিত। সেই পর্বতমালার পাদদেশে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে এ যুদ্ধটি হয়েছিল। তাই এর নাম ওহুদের যুদ্ধ। ওহুদের যুদ্ধ হয়েছিল আগস্ট মাসে। ৬২৪ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে। কেউ কেউ বলেন ২৪ আগস্ট, ৭ তারিখ, কেউ বলেন ১৫ তারিখ। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মদীনা থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) সৈন্যবাহিনী নিয়ে বা তার সাহাবীদেরকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে বের হয়েছিলেন এবং শনিবার দিনের বেলা ওহুদের প্রান্তরে যুদ্ধটি হয়েছিল। তবে আমরা কোনো অবস্থাতেই এসব খুটিনাটি বিষয় নিয়ে বিতর্কে যাবো না। কারণ সঠিক তারিখ নির্ণয় বা সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য এ গ্রন্থ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, আজকের প্রজন্মের মুসলমানগণ, ছাত্র/ছাত্রীগণ, তরুণ/তরুণীগণ পৃথিবীর যেখানেই যে যে প্রান্তে আছেন না কেন তারা সকলে হয়তোবা এসব ইতিহাস জানেন না। তাদেরকে কিছুটা জানানো। কারণ না জানলে দ্বীন ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহ বা মহব্বত, রাসুল পাক (সা.)এর প্রতি এবং সাহাবীদের প্রতি মহব্বত, ইসলামের ইতিহাসের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়বে না।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট:

ওহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বলতে গেলে আমাদেরকে বদরের যুদ্ধ থেকে কথা টানতে হবে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়েছিল। কিন্তু পরাজিত হবার কারণে কোরাইশ বংশ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলো। বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের কারণে মক্কাবাসীরা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তবে তারা তাদের মানসিক যন্ত্রণা

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে জানতে দিচ্ছিল না। তারা তাদের শোককে শক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করে ভেতরে ভেতরে প্রতিশোধ স্পৃহাতে জ্বলছিল। এটি হল প্রথম কারণ যে, আমাদেরকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। দ্বিতীয় হল, সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য, হক বা বাতিলের মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে আরও বেড়ে উঠলো এবং বাতিল শক্তি বা মিথ্যা শক্তি বা অপশক্তি বা জালেম শক্তি কোনো অবস্থাতেই হক বা সত্যকে প্রস্ফুটিত হতে দেবে না এই সংকল্প প্রকাশ করতে থাকলো। তৃতীয় কারণ হল, মদীনা নামক শহর, মদীনা নামক বসতি, মাদীনাকে কেন্দ্র করে একটি সভ্যতা এবং নগর গড়ে উঠছিল। যার প্রভাব আরব উপদ্বীপে এবং সিরিয়া লেবানন ইত্যাদি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং মক্কার কোরাইশগণ ক্রমেই গৌণ হয়ে যাচ্ছিল। এই বিষয়টিকে মক্কার সেনাপতিগণ, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কোনোমতেই গ্রহণ করতে পারছিল না। তারা সিদ্ধান্ত নিল কোনোভাবেই মদীনাকে আর বড় হতে দেয়া যাবে না, এটাকে ধ্বংস করতেই হবে। আরেকটি কারণ আছে, মহনবী (সা.) ছিলেন কোরাইশ বংশের ব্যক্তি। তাই কোরাইশরা যেমন তাঁর এ সাফল্য মেনে নিতে পারেনি, তেমনি মদীনায় বসবাসকারী ইহুদী সম্প্রদায় বদরের যুদ্ধের পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। এজন্য তারা ষড়যন্ত্র করছিল ভেতরে ভেতরে থেকে। অর্থাৎ তারা ছিল ঘরের শত্রু। তারা চাচ্ছিল মুসলমানগণ যেন ধ্বংস হয়ে যায়। এ জন্য তারা একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল মনে মনে। আর সর্বশেষ হচ্ছে মুসলমানদের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছিল সেটা যেন নষ্ট করা যায় সে জন্য কোরাইশ এবং ইহুদী উভয়ে মিলে চেষ্টা করলো। এই প্রেক্ষাপটে মক্কার কোরাইশগণ একটা সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলো। আবু সুফিয়ানের যে কাফেলা বদরের যুদ্ধেও কারণ হয়েছিল, যে কাফেলাকে সে নিরাপদে সরিয়ে নিতে পেরেছিল, সেই মালামাল পরবর্তী যুদ্ধের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। মালামালের মালিকদের বলা হল যে, কোরায়েশ বংশের লোকেরা শোনো, মুহাম্মদ তোমাদের উপর কঠিন আঘাত করেছে, তোমাদের নির্বাচিত সরদারকে ওরা হত্যা করেছে, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তোমাদেরকে অর্থ দিয়ে মালামাল দিয়ে সাহায্য করতে হবে তাহলে আমরা প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হবো। কোরায়েশরা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের মালামাল দান করতে রাজী হয়। এ সময় আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন। বলা হয়, *"ইন্নাল্লাজিনা কাফারু ইয়ুনফিকুনা আমওয়ালাহুম লিয়াছুদ্দু আন ছাবিলিল্লাহ; ফাছাইয়ুনফিকুনাহা ছুম্মা তাকুনু আলাইহিম হাছরাতান ছুম্মা ইয়ুগ্বলাবুন।"* অর্থাৎ আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য কাফেররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতপর সেটা তাদের দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিতও হবে এবং আরও পরে এই কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। (সুরা আনফাল, আয়াতঃ ৩৬)

www.pathagar.com

কোরাইশদের সৈন্য সংখ্যাঃ

কোরাইশদের সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩,০০০। আরেকটু বিস্তারিত তথ্য দেই। এ বাহিনীর সেনাপতি হলেন আবু সুফিয়ান। যেই আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বদরের যুদ্ধের আগে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা এসেছিল এবং নিরাপদে মক্কা পৌছে গিয়েছিল। সে ছিল উমাইয়া বংশের লোক। সেই আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩,০০০ সদস্যের একটি সৈন্য বাহিনী তৈরি হল। তার মধ্যে ৭০০ জন ছিল বর্মধারী অর্থাৎ নিরাপত্তার জন্য তাদের শরীর ঢাকা ছিল, ৩০০ জন ছিল উস্ট্রারোহী অর্থাৎ তারা ছিল উটের উপর, ২০০ জন ছিল অশ্বারোহী। যুদ্ধক্ষেত্রে কোরায়েশদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য তারা কিছু মহিলাও আনলো। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার নেতৃত্বে ১৪ জন মহিলা এসেছিল। তারা গান-বাজনা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে সৈন্যদলকে উৎসাহিত রাখতো।

মজলিসে শূরার বৈঠক, স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং বিস্তারিতঃ

এ সময় মহানবী (সা.) মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করলেন। সেখানে মদীনার প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারটি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিন্তা চলছিল। মহানবী (সা.) শুরুতেই তাঁর দেখা একটা স্বপ্নের কথা উপস্থিত সাহাবাদেরকে জানালেন। আল কোরআন একাডেমী লন্ড কর্তৃক প্রকাশিত আর রাহীকুল মাখতুম গ্রন্থের ২৫৫ পৃষ্ঠা এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত ইবনে হিশাম গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় স্বপ্নের কথাটি এসেছে এভাবে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন যে, আল্লাহর শপথ আমি একটি ভালো জিনিস দেখেছি। আমি দেখলাম কিছুসংখ্যক গাভীকে যবাই করা হচ্ছে। আমি দেখলাম আমার ধারালো তরবারির আগায় যেন ফাটল ধরেছে। আমি আরও দেখলাম যে, আমি আমার একটি হাত নিরাপদ বর্মের ভেতরে প্রবেশ করিয়েছি। এরপর তিনি নিজেই এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বললেন যে, গাভী যবাই করার অর্থ হচ্ছে আমার কিছু সংখ্যক সাহাবী শহীদ হবে। তলোয়ারে ফাটলের অর্থ হল, আমার পরিবারের একজন শহীদ হবেন। আমার একটি হাত নিরাপদ বর্মের ভেতরে ঢোকানোর অর্থ হল, মদীনা শহর সুরক্ষিত হবে।

বস্তুত, ওহুদের যুদ্ধে জয়লাভের পর মদীনা অতিরিক্ত সুরক্ষিত হল। রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনায় পোক্ত হলেন। আর তাঁর নগর রাষ্ট্র পোক্ত হল এবং তাঁর পরিবারভুক্ত আপন চাচা হযরত হামজা (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। সাথে আরও শহীদ হয়েছিলেন ৭০ জন মতান্তরে ৭২ মতান্তরে ৭৪ জন সাহাবী। এর আগে মদীনায় যখন তারা খবর পেলেন যে, মক্কা থেকে সৈন্য বাহিনী রওনা দিয়েছে তখন নিজেরা পরামর্শ সভায় বিভিন্ন আলোচনা করলেন। পরামর্শ সভায় যাঁরা জেষ্ঠ সাহাবী, তারা বলল যে, আমরা মদীনার ভেতরেই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেব, যদি শত্রু আমাদেরকে

www.pathagar.com

আক্রমণ করে তাহলে শহরের ভিতরে থেকে আমরা যুদ্ধ করব। আর যারা কনিষ্ঠ, তারা বললেন যে, আমরা মদীনার প্রান্তরে উন্মুক্ত জায়গায় গিয়ে মোকাবিলা করতে চাই। তাদের আগ্রহ এবং আবেগ বেশি ছিল। হয়তোবা এ কারণে যে, তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি বলে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করে নিজেদের শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করতে চাচ্ছিল। কেউ কেউ বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আলোচনা শোনার পর তিনি তার নিজের মতের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুকূলে গিয়েছেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবেন। তাই তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে পোশাক পরে আসলেন। এরপর হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)কে নিয়ে তৈরি হলেন এবং সকল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হলেন। এ সময় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,০০০ জন। পথের মধ্যে ২/৩টি ছোট ছোট ঘটনা ঘটে। এক হল, একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন যার নাম হল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তিনি পরবর্তীতে মোনাফিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। সেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই পরামর্শ দিয়েছিলেন মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু পরে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে রওনা দিলেন বাইরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি হঠাৎ করে বেঁকে বসলেন। তার সঙ্গে ছিল ৩০০ জন। তিনি বললেন আমার মতের বিপক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবো না। আমি এখান থেকে ফেরত যাচ্ছি। এই বলে তিনি তার ৩০০ লোক নিয়ে ফেরত আসলেন। এছাড়া তিনি আরও লোককে প্রভাবিত করতে চাইলেন যে, তারাও যেন ফেরত আসে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হুকুম বা দয়া যে, আর কোনো লোক তার কথায় প্রভাবিত হল না। ঐ সময় খাজ্জাজ গোত্রের বনু সালমা এবং আউস গোত্রের বনু হারিসা নামক দুটি গোত্রের কাছে গিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হল যে, তোমরা যুদ্ধে যেও না। এই যুদ্ধ তোমাদের জন্য ক্ষতিকারক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দয়া, তারা থেকে গেল। এ ব্যাপারে সুরা আল ইমরান এর ১২২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, *"ইজ হাম্মাত ত্বা—য়িফাতানি মিনকুম আন তাফশালা ওয়াল্লাহ অলিইয়্যুহুমা; অ আলাল্লাহি ফালইয়াতাঅক্কালিল মু'মিনুন"* অর্থাৎ 'স্মরণ কর, তোমাদের মধ্য হতে যখন দু'টি দল কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা দেখানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল অথচ আল্লাহ সাহায্যের জন্য বর্তমান ছিলেন। আর ঈমানদার লোকদের তো আল্লাহর উপর ভরসা রাখা উচিত'। আবার এর পরের আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইতিপূর্বেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা তখন দুর্বল ছিলে। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে ভয় কর। যাহোক, আব্দুল্লাহ ইবনে উবার তার ৩০০ লেক নিয়ে ফেরত গেল এবং মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো ৭০০ জন। এই ৭০০ জনকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) ওহুদের ময়দানে গেলেন। সেখানে কিশোরদের যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু একটা ঘটনা বলতেই

www.pathagar.com

হবে যে, এক কিশোর আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে লম্বা দেখিয়ে বা বড় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি নিলেন। অর্থাৎ এরকম ছিল মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ, আল্লাহ্ রাস্তায় শহীদ অথবা বিজয়ী হবার আগ্রহ। মুসলমানদের এই ৭০০ সৈন্যের মধ্যে ২ জন ছিলেন অশ্বারোহী, ১০০ জন ছিলেন বর্মধারী, ৫০ জন তীরন্দাজ। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মহিলা ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ তাদের মধ্যে ছিলেন রাসুলে পাক (সা.) এর সহধর্মিনী বিবি আয়েশা (রা.), হযরত উম্মে সুলাইমা, হযরত উম্মে সুহাইক এবং আরও ২/১ জন। উনারা যুদ্ধের ময়দানে আঘাতপ্রাপ্ত সাহাবীদের শশ্রুষা করেছেন, পানি খাইয়েছেন, এ প্রমাণগুলো হাদীস থেকে পাওয়া যায়। বদরের যুদ্ধের মত ওহুদের যুদ্ধের বর্ণনাও কুরআন এবং হাদীসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা আছে।

ওহুদের যুদ্ধের প্রান্তরে মুসলমানরা আসলেন শুক্রবার দিনের বেলা শেষাংশে। এসে অবস্থান নিলেন। যুদ্ধটি হয়েছিল পরের দিন শনিবার। বদর প্রান্তরে শত্রু এবং মুসলমানদের অবস্থান ছিল সামনাসামনি। তবে পাহাড়ের পেছন দিয়ে একটি রাস্তা সুরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিল যেটি মানচিত্র দেখলে অনুমান করতে সহজ হবে। কল্পনা করে নেয়া যায় যে, আমরা শত্রুর সামনে আছি, আমার বামে পাহাড় এবং তার পেছনে ছড়া (যা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়)। ঐ ছড়া দিয়ে শত্রুরা আক্রমন করতে পারে। সেই জায়গাটি সুরক্ষিত রাখার জন্য ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীকে সেখানে অবস্থান নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হল। তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা কোনো অবস্থাতেই এ অবস্থান থেকে নড়বে না, আমরা যুদ্ধে জয়ী হই অথবা পরাজিত হয়। এরকম একটি হুকুম দিয়ে মহানবী (সা.) তাদেরকে একজন সাহাবী বা নেতার নেতৃত্বে এখানে মোতায়েন করলেন। এ কথাটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কারণ, এটি ওহুদের যুদ্ধের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুরা আল ইমরানের ১২১ নম্বর আয়াতে এ সময়টির কথা বলা হয়েছে। *"ওয়াইজগাদাউতা মিন আহলিকা তুবাব্বিউল মু'মিনীনা মাক্বাইদা লিল ক্বিতালা; অল্লা হু ছামীউন আলিম"।* অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজ ঘর হতে বের হয়েছিলে যুদ্ধে (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য জায়গায় জায়গায় নিযুক্ত ও মোতায়েন করেছিলে। আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন এবং জানেন। যুদ্ধ শুরু হল। প্রথমেই তারা তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী তিনজন এগিয়ে এলেন এবং মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসতে বললেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও তিনজন এগিয়ে গেলেন এবং ব্যক্তি-ব্যক্তি যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ী হলেন এবং বিধর্মীরা হেরে গেল। হেরে যাওয়ার পর তারা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা একজন একজন করে যুদ্ধ না করে খণ্ড যুদ্ধ শুরু করে দিল। যখন খণ্ড যুদ্ধ শুরু হল তখন দু'টি কাজ একসঙ্গে হচ্ছিল। এক. সামনাসামনি লড়াই চলছে, অন্যদিকে শত্রুপক্ষের একটি দল পাহাড়ের দক্ষিণ দিক

www.pathagar.com

দিয়ে অর্থাৎ পেছনের সেই ছড়া দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ নামক বিখ্যাত ব্যক্তির নেতৃত্বে অপেক্ষা করছে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য। এই খালিদ বিন ওয়ালিদ পরে মুসলমান হয়েছিলেন এবং যার উপাধি ছিল 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারী। সেই খালিদ বিন ওয়ালিদ চেষ্টা করলেন ঘুরে গিয়ে আক্রমণ করার জন্য, যে আশংকাটি করেছিলেন ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)। আর তাই ৫০ জনকে ওখানে তৈরি রেখেছিলেন। যে কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদ সেখানে যেতে পারলেন না। এখানে দুটি বিষয় হল। এক. এক স্থানে খণ্ড যুদ্ধ, দুই. পেছন দিয়ে মুসলমানদের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা।

এই খণ্ড যুদ্ধ চলার সময় কে কার উপর চড়াও হচ্ছে সেটা বলা খুব মুশকিল। একটি উল্লেখ করছি, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চাচা হযরত হামজা (রা.) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাঁকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করে এসেছিল। সে ওয়াসি নামক এক কৃতদাসকে কাজে লাগিয়েছিল। হিন্দার প্রতিশোধ স্পৃহার কারণ কী? কারণ, তার বাবা এবং ভাই বদরের যুদ্ধে হযরত হামজা (রা.) এর হাতে নিহত হয়েছিল। হিন্দা সেই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কোনো এক পর্যায়ে হযরত হামজা (রা.) শহীদ হলেন ওয়াসির হাতের একটি বর্শার আঘাতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, হযরত হামজা (রা.) শহীদ হবার পর তার দেহকে ছুরি দিয়ে চিরে ফেলা হয়। এরপর তাঁর কলিজা বের করে হিন্দা কাঁচা চিবাতে চেষ্টা করে। মুসলমানরা এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সা.) এটা দেখেছেন এবং তিনি এত বিমর্ষ হয়েছেন যে নিজেকে সংযত করতে একটু সময় লেগেছিল। এ যুদ্ধে আরও সাহাবাগণ শহীদ হচ্ছিলেন। শত্রুরাও মারা যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে শত্রুরা রাসুলুল্লাহ (সা.)কে ঘিরে ফেলে। ঘিরে ফেলার পর খুব কাছে থেকে তাঁকে আঘাত করে। একটি পাথরের আঘাত রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মুখে ডানদিকে লাগে। তিনি প্রচ আঘাত পান। তাঁর কয়েকটি দাত পড়ে যায়, রক্ত নির্গত হতে থাকে, শরীরেও আঘাত লাগে। রাসুলুল্লাহ (সা.) আঘাতপ্রাপ্ত হবার পর কুরাইশরা রটনা করে দিল যে, 'মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।' আমরা রাসুলের নাম শোনার সাথে সাথেই বলব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই রটনায় কুরাইশরা খুব উল্লসিত হয়ে উঠে যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে দিল। তারা মনে করলো যে তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাই তারা হামলা বন্ধ করে দিয়ে লাশের উপর মনের পৈশাচিক ঝাল মিটাচ্ছিল। তারা শহীদদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলছিল। আর মুসলমানরা মহানবী (সা.) এর এই খবর পেয়ে বিমর্ষিত হয়ে গেল। এটি ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই নাজুক একটি মুহূর্ত। তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তবে একটি কথা এখানেই বলে নিতে হবে, এই বিপর্যয়ের মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.)কে মাঝখানে রেখে সাহাবীরা একটি প্রতিরক্ষা বুহ্য বা প্রতিরক্ষা

www.pathagar.com

বেড়ার মত বেস্টনি দিয়ে রেখেছিলেন, সুরক্ষিত রেখেছিলেন। আঘাত তারা নিজেরা গ্রহণ করেছিলেন, রাসুলের কাছ পর্যন্ত আঘাত আসতে দিতে চাননি। হযরত আবু তালহা নামক একজন সাহাবী তাঁর নিজের পিঠে ৭০টি তীরের আঘাত গ্রহণ করেছিলেন তবুও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছ থেকে সরেননি, অথচ সে তীরগুলোর লক্ষ্য ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি, দ্বীন ইসলামের প্রতি এই ছিল মুসলমানদের প্রেম, ভালোবাসা। এ পর্যায়ে সাহাবীরা মহানবী (সা.)কে টেনে পাহাড়ের একদিকে নিয়ে আসলেন। এরপর মা ফাতিমা (রা.) তাঁর চিকিৎসা করেছেন, পানি দিয়ে, কাপড় দিয়ে সেখানে ব্যান্ডেজ করেছেন, এগুলো হাদীসে বলা আছে, ইতিহাস গ্রন্থে বলা আছে। কুরাইশরা যুদ্ধের তীব্রতা কমানোর কারণে পাহাড়ের পাশে যে ৫০ জন তীরন্দাজ ছিল তাঁরা মনে করলেন যে, কুরাইশরা পরাজিত হয়েছে, আমরা জিতে গেছি। তাঁরা এই ভুল ধারণা করে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে ৫০ জনের মধ্যে ৩৮/৪০ জন যুদ্ধের ময়দানের দিকে নেমে গেলেন। বলা হয়, তারা সেখানে শত্রুর সন্ধান করছিলেন অথবা গণিমতের মাল সন্ধান করছিলেন। সেই সুযোগটি নিল খালিদ বিন ওয়ালিদ। তিনি পেছন দিয়ে এসে মুসলমানদের উপর প্রচ ভাবে আক্রমণ করলেন। যে ভয়টি রাসুলুল্লাহ (সা.) করেছিলেন। তবে এ পর্যায়ে এসে মুসলমানরা যখন জানলেন যে তাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবিত আছেন তখন তাদের মধ্যে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতা তৈরি হল। তারা পুনরায় নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করলেন। তাঁরা খালিদ বিন ওয়ালিদের আক্রমণ মোকাবিলা করলেন। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে মুসলমানরা আবার রুখে দাঁড়াতে পারলো। খালিদ বিন ওয়ালিদ কিছু ক্ষতি করলো কিন্তু শেষে পিছে ফিরে যেতে বাধ্য হল। এ পর্যায়ে কুরাইশরা যখন শুনলো যে, মুহাম্মদ নিহত হয়নি তখন তারা একদম দমে গেল। তখন তারা বলল যে, যা মারার মেরেছি, আজকের জন্য যুদ্ধ শেষ। আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ফিরে যাওয়ার সময় বলল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় লড়াই করার প্রতিজ্ঞা রইল। আবার আগামী বছর দেখা হবে। কুরাইশরা যুদ্ধ থামিয়ে একত্রিত হয়ে মক্কার দিকে রওনা হল। মুসলমানরা চিন্তা করলেন যে, বদরের যুদ্ধে আমরা তাদের পেছনে ধাওয়া করিনি, এবার করতে হবে। তাই তারা কুরাইশ বাহিনীর পেছনে পেছনে ৮ মাইলের মত দূরত্বে গেলেন, যাতে কুরাইশ বাহিনী ফিরে না আসে। মুসলমানরা যখন নিশ্চিত হল যে, তারা আর ফিরে আসবে না তখন মুসলমান বাহিনী ফেরত আসলেন।

ওহুদের যুদ্ধের যে গিরিপথ তার গুরুত্ব রাসুলুল্লাহ (সা.) অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি একটি গোষ্ঠীকে সেখানে থাকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু দায়িত্বরত গোষ্ঠীর একটা বড় অংশ যে কোনো কারণেই হোক, তাদের দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। যার পরিণতি এবং বিপর্যয় মারাত্মক হয়েছিল।

www.pathagar.com

ওহুদের যুদ্ধে হতাহত হয়েছিলেন অনেকেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চাচা হযরত হামজা (রা.)সহ মোট ৭৪ জন শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ৭০ জন ছিলেন আনসার এবং ৪ জন ছিলেন মুহাজের সাহাবা। কুরাইশদের পক্ষে ২৩ জন সৈন্য নিহত হয়। যাদের মধ্যে ১৭ ছিল বিশিষ্ট কুরাইশ ব্যক্তিত্ব।

পর্যালোচনা:

বিপর্যয়ের কারণ কী?: এক হল যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবাদের মধ্যে মতের বিরোধ। দ্বিতীয়, নির্দেশ পালনে অবহেলা অর্থাৎ যে ৫০ জন সাহাবাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তাদের সে দায়িত্ব পালনে শিথিলতা বা আরেকটু বলতে গেলে নির্দেশ অমান্য করা। তিন. রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হত্যা করা হয়েছে এ ধরণের একটি গুজব ছড়িয়ে দেয়া। সে সময় পবিত্র কুরআনে আয়াতও নাজিল হয়েছিল মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে। সুরা আল ইমরান এর ১৪৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে *"ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুল, ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুছুল; আফাইম মাতা আউ কুতিলান ক্বালাবতুম আলা—আ'কা বিকুম ওয়ামাইয়ানক্বালিব আলা আক্বিবাইহি ফালাই ইয়াদুররাল্লা হা শাইআ; ওয়া ছাইয়াজ্বযিল্লাহুশ শাকিরীন"* অর্থ: মুহাম্মদ একজন রাসুল ছাড়া আর কিছুই নয়, এর পূর্বেও অনেক রাসুল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি সে মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাবে? মনে রেখ, কেউ পৃষ্ঠ দেখালে সে আল্লাহর সামান্য ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে সত্বর পুরস্কার দিবেন। এ যুদ্ধের তাৎপর্যের কথা বলতে গেলে বলতে হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু সংখ্যক মুসলমানকে শহীদ হবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ দিয়েছেন ওহুদ যুদ্ধের মাধ্যমে। অর্থাৎ মুসলমানরা চেয়েছিলেন শাহাদাত এবং বিজয়, তারা তাই পেয়েছিলেন। ইহুদীরা চেয়েছিল আত্মরক্ষা, তারাও সেটা পেয়েছিল, কুরাইশরা চেয়েছিল প্রতিশোধ, তারাও সেই প্রতিশোধ পেয়েছে। অর্থাৎ সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি, আর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনা অনুযায়ী ফল দেন। তবে কুরাইশদের বিজয় ছিল সাময়িক এ কথাটি মনে রাখতে হবে। কারণ ওহুদের প্রান্তরে তারা জয়ী হলেও তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ মহানবী (সা.)কে তারা হত্যা করতে পারেনি এবং মদীনা শহরকেও তারা ধ্বংস করতে পারেনি। অনেকেই বলেন যে, ওহুদের যুদ্ধে বিধর্মীগণ বিজয়ী হয়েছে। আসলে কথাটি বিভ্রান্তিকর। শুধু কোন পক্ষে কতটা প্রাণহানী ঘটলো সেটাই কেবল জয়-পরাজয় নির্ণয়ের মাপকাঠি নয়।

ওহুদের যুদ্ধের শিক্ষা হল, সেনাপতির আদেশ অমান্য করলে অবশ্যই মাশুল দিতে হবে। শিক্ষা হল, যুদ্ধের সময় সকল দিকের রাস্তায় নজর রাখতে হয়, তা না হলে মাশুল দিতে হয়। শিক্ষা হল, আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হয়, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হতে হয় না।

www.pathagar.com

ওহুদের যুদ্ধের হেকমত:

ওহুদের যুদ্ধের হেকমত কিছু কিছু গ্রন্থে এবং কিছু কিছু তাফসীরে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম মনে করেন, ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে যে সঙ্কট ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল; এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হেকমত লুকিয়ে ছিল। যেমন তাদের খারাপ কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা, তীরন্দাজদের যে স্থানে অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা লঙ্ঘন করার কারণে বিপর্যয় আসা। এছাড়া পয়গাম্বরের কাছে সেই সুন্নতের কথা প্রকাশ করাও উদ্দেশ্য যে, তারা প্রথমে পরীক্ষার সম্মুখীন হন, এরপর সফলতা লাভ করেন। যদি মুসলমানরা সবসময় জয়লাভ করতে থাকে, তাহলে ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোকও প্রবেশ করবে যারা ঈমানদার নয়। তখন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে না। আবার সবসময় পরাজিত হলে আল্লাহর নবীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কারণে উভয় রকম অবস্থারই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই যুদ্ধের আরেকটি হেকমত ছিল যে, আল্লাহ তার বন্ধুদের জন্য উচ্চতর মর্যাদা যে শাহাদাত, সেই মর্যাদা তিনি কাউকে কাউকে দান করেছেন।

উপসংহার:

ওহুদের প্রান্তরটি এখনো বিদ্যমান। জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। তার মাঝখানে শহীদদের দাফন করা হয়েছিল। এখনও যারা ওখানে সফরকারী হিসেবে বেড়াতে যান, পর্যটক হিসেবে যান তারা সেখানে গিয়ে কবর জিয়ারত করেন, দোয়া করেন এবং স্থানটি অবলোকন করেন। একজন সামরিক ব্যক্তি হিসেবে আমি যখন অবলোকন করেছি তখন চেষ্টা করেছি যুদ্ধের কথাটি চিন্তা করে অবলোকন করতে। আল্লাহ তায়ালার দয়া হয়েছিল, তিনি আমাকে আমার মত করে বুঝতে সাহায্য করেছেন।

বলা হয়ে থাকে ওহুদের মাটি এমন কিছু মানুষের রক্তে রক্তিত হয়েছে, যে কারণে ওহুদের এ মাটি পূণ্যভূমি। ইসলামের অন্যতম পূণ্যভূমি এই ওহুদের ময়দান। ওহুদের ময়দানের ইতিহাস বর্ণনা যুগে যুগে মুসলমানদেরকে উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত, উৎসাহিত করতে থাকবে, বিশেষত যারা সৈনিক তাদেরকে।

www.pathagar.com

খন্দকের যুদ্ধ

ভূমিকাঃ

মানুষের হিদায়াত এবং সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসুলে আকরাম (সা.) ছিলেন সর্বযুগের জন্য মানবতার মুক্তিদূত। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে এমনকি নবী রাসুলদের মধ্যেও যে অনুপম চরিত্র ও গুণাবলী ছিল, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মধ্যে এককভাবেই সেইসব গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ ছিল।

তবে এসব বিরল বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই একজন অকুতোভয় ও অপরাজেয় সেনাপতিও ছিলেন তিনি। রণাঙ্গনে সবার আগে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিপুনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা, সৈন্য পরিচালনা করার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তাঁরই মধ্যে ছিল। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি একাধিক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এসব প্রতিটি যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য, মাহাত্ম্য রয়েছে। তাঁর এক একটা যুদ্ধ এক একটা বিরাট ঘটনাবহুল ইতিহাস। রাসুলের নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদরের যুদ্ধ। ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে ১০০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে এ যুদ্ধে তিনি বিজয় অর্জন করেছিলেন। এর পরের যুদ্ধ ছিল ওহুদের যুদ্ধ। তারপর সংঘটিত হয়েছে খন্দকের যুদ্ধ। এরপর আরও বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ের আলোচনা খন্দকের যুদ্ধ নিয়ে।

খন্দকের যুদ্ধটা বিভিন্ন নামে পরিচিত। এটাকে বলা হয়েছে খন্দকের যুদ্ধ, বলা হয়েছে গোত্রের যুদ্ধ, আবার মদীনা অবরোধও বলা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধের মাত্র দুই বছর পর ৫ম হিজরীর ৮-২৯ শাবান, ৬২৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারিতে সংঘটিত এই যুদ্ধ ছিল মহানবী (সাঃ) এর জমানার এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান।

যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরিঃ

খন্দকের যুদ্ধের ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছিল ওহুদের যুদ্ধের পরেই। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ শুরুতেই বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেলেও রাসুল (সা.) এর নির্দেশ পুরোপুরি না মেনে চলার কারণে পরবর্তীতে তা বিপর্যয়ে রূপ নেয়। শত্রুরা এ যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসেবেই মনে করে। এ যুদ্ধের পর মক্কার কাফিররা যখন

www.pathagar.com

ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এলো তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো এই মনে করে যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমন চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেওয়াই উচিত ছিল। যদিও তখন তারা ফিরে গেল কিন্তু তাদের মনে এ চিন্তাটা থেকেই গেল যে, মুসলমানদের আবার আক্রমণ করতে হবে। আবু সুফিয়ান ঘোষণা দিয়ে গেল যে, আগামী বছর আবার তারা মুসলমানদের শক্তি পরীক্ষা করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

এদিকে কোরাইশরা ওহুদের যুদ্ধে যদিও এক ধরণের বিজয় অর্জন করেছিল; কিন্তু মদীনাকে তাদের নগর-রাষ্ট্র মক্কার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেখানে কোনো সেনাদল রেখে যায়নি এবং সেই সেনাদলের সাহায্যে তাদের বাণিজ্য বহরের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থাও করেনি। এমনকি মুসলমানদের অধিকারে থাকা বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলো দখলের কোনো চেষ্টা তারা করেনি। তার ফলে মুসলমানরা কিছুদিনের মধ্যেই তাদের আগের অবস্থা ফিরে পায় এবং আরো কিছুদিনের মধ্যে তাদের অবস্থা আরও উন্নতি করে ফেলে। এর ফলে মক্কার কাফেলার জন্য সিরিয়া, মিশর এবং ইরাকে যাওয়ার উত্তর-পূর্বের রাস্তাটিও বন্ধ হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে বানু আন্-নাজির গোত্রের ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হলেও তারা সিরিয়া যাওয়ার রাস্তার উপর অবস্থিত বিশ্রামস্থলগুলোতে বসবাস করতে শুরু করলো এবং একইসাথে আশেপাশের লোকজনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। যার কারণে খন্দকের যুদ্ধে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সম্ভাবনা থাকলো। কারণ ইহুদীরা যখন শুনলো যে ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা বিপর্যস্ত হয়েছে এবং আবু সুফিয়ান তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার আবার হুমকী দিয়েছে তখন তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তারা কুমন্ত্রণা দিতে এবং গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাতে পূর্ব থেকেই সিদ্ধহস্ত ছিল। ইহুদীদের ষড়যন্ত্রেই দুমাত আল জান্দালের শাসক মদীনাগামী বহরকে মদীনায় যেতে বাধা দিল একইসাথে মক্কাবাসী গাতাফান গোত্রের লোকজন নিয়ে একত্র হলো মদীনা শহরকে ধবংস করা এবং মহানবী (সা.)কে হত্যা করার জন্য। এগুলো ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের অংশ।

খনন কাজ শুরু এবং ভৌগলিক অবস্থান:

খন্দকের যুদ্ধে মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। এই যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য প্রথমে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে এক সভা করলেন। শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য শহরের বাইরে যাওয়া উচিত হবে

www.pathagar.com

কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত বাইরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল এবং শত্রু যেন শহরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য এই অভিনব পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হল। সিদ্ধান্ত হল 'সাল' পাহাড়কে ভিতরে রেখে বাইরের দিক দিয়ে পরিখা খনন করা হবে এবং প্রায় তিন হাজার গজ লম্বা এ পরিখা এমন গভীর এবং প্রশস্ত হবে যেন লাফ দিয়ে ঘোড়া পার হতে না পারে। মহানবী (সা.) খন্দকের পরিকল্পনা করে সেটাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করলেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ চওড়া ও গভীর করে খোঁড়ার জন্য দশ জনের একটা দলকে দেয়া হল চল্লিশ হাত জায়গা। এ থেকে অনুমান করা যায় খন্দকটির দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে তিন মাইল বা সাড়ে পাঁচ কিলোমিটারের মতো। মুসলমানগণ দলে দলে বিভক্ত হয়ে মাটি খননে লিপ্ত হলেন। প্রথমে সিদ্ধান্ত হলো যে, একটা N আকৃতির পরিখা খনন করা হবে। এটা উত্তর পূর্বের শাইখাইনের জোড়া কেল্লা থেকে শুরু হয়ে মাদহাদের 'বিদায়ী পর্বত' ঘেষে পশ্চিমের বানু উবাইদ পাহাড় পর্যন্ত চলে যাবে এবং সেখান থেকে পর্বত সালে ফিরে এসে 'বিজয় মসজিদ' পর্যন্ত পৌছাবে। এজন্য খন্দকের পূর্ব পাশ শাইখাইনের টুইন টাওয়ার থেকে যুবাব পাহাড় পর্যন্ত এলাকা খোঁড়ার দায়িত্ব ন্যস্ত হল মোহাজিরদের ওপর। খন্দকের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ যুবাব পাহাড় থেকে কিবলাতাইন মসজিদের নিকটবর্তী বানু উবাইদ পাহাড় পর্যন্ত এলাকা এবং মাদহাত অতিক্রম করে সাল পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত বিজয় মসজিদ পর্যন্ত এলাকা খোঁড়ার দায়িত্ব দেয়া হল সংখ্যাগরিষ্ঠ আনসারদের ওপরে। যুবাব পাহাড় এখনও ঐখানেই রয়েছে। তবে বানু উবাইদ পাহাড়ের নামটা পাল্টেছে। এই খন্দকের যুদ্ধে তিন হাজার অনিয়মিত মুসলিম বাহিনীর সাথে মাত্র ৩৫ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল যারা খন্দকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেয়া শুরু করলেন।

পরিখা খননে রাসূল (সা.)সহ সাহাবীদের অংশগ্রহণ:

এই পরিখা খননের সময় মুসলমানদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। মদীনা অবরোধ যখন শুরু হল তখন শত্রুরা কতদিন মদীনা অবরোধ করে রাখবে সেটা জানা ছিল না। বিপদকালের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন ছিল। পরিখা খননের জন্য তাদের কাছে আলাদা কোনো মজুর ছিল না। তাই সাহাবীরা নিজেই এই খনন আরম্ভ করলেন।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে সে সময় মদীনায় খুব শীত পড়ছিল, তারপর অল্প অল্প বৃষ্টিপাতও হচ্ছিল। পরিকল্পনা ছিল কয়েক মাইল লম্বা, যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হবে যাতে শত্রুরা সহজে সেটা অতিক্রম করতে না পারে। খনন কাজ দ্রুত শেষ করার দরকার ছিল। তাই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিগণ (রাঃ) কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকাজে মশগুল ছিলেন। সাহাবীদেরই

www.pathagar.com

কেউ মাটি কেটেছেন আবার কোনো সাহাবী সেই মাটি বহন করেছেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সা.) এই খনন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের পরে আল্লাহর রাসুলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আপনাকে কিছুটা কুজো দেখাচ্ছে, এটা কি বয়সের কারণে নাকি? আল্লাহর রাসুল জবাব দিয়েছিলেন, না এটা বয়সের কারণে না। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় আমি মাটি কেটেছি সাহাবীরা সেই মাটি বহন করেছে আবার সাহাবীরা মাটি কেটেছে সেই মাটি আমি বহন করে করে কোমরে যে ব্যাথ্যা হয়েছিল সেই ব্যাথা এখনও ভালো হয়নি। এর থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় বিশ্বমানবতার দূত আল্লাহর রাসুল কিভাবে সামনের থেকে সব বিষয়েই নেতৃত্ব দিতেন। এ ঘটনাটি পৃথিবীর তাবত নেতাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

দুশমনদের আগমনঃ

যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সর্বপ্রথম আবু সুফিয়ান তিনশত ঘোড়া, এক হাজার উট এবং চার হাজার কুরাইশ সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে বের হল। তাদের সাথে 'গাতফান', 'আসাদ', 'ফাযারা', 'আশজা' 'মুররা' প্রভৃতি গোত্রের সৈন্য এসে তাদের সাথে সমবেত হল এবং তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজার। তারা মুসলমানদের বিলুপ্ত করার জন্য দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলো। মুশরিক সেনাবাহিনী বিনা বাধায় মদীনার পূর্বাংশে পৌছে ওহুদ পাহাড় সংলগ্ন স্থানে নিজেদের শিবির স্থান করলো। তারা রইলো রুমাহ থেকে পশ্চিমে জুরাফ এবং আল গাবাহ বনাঞ্চলের মাঝখানে জাগহাবাহ নদীর সংগমস্থলে। তাদের সাথে ছিল আবাহিশ সম্প্রদায়ের ভাড়াটে সৈন্য এবং কিনানাহ ও তিহামাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা। কুরাইশদের সাথে গাতাফান এবং ফাজারাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা হাত মিলিয়েছিল ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে। দুশমনরা যখন তাদের আস্তানায় স্থির হলো তখন মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরাও সাল পর্বতের কাছে তাঁদের তাবু গাড়লেন। মহানবী (সা.) এর তাবুটিও যুবাব পর্বত থেকে সেই স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে এখন রয়েছে বিজয় মসজিদ। প্রথমে মহানবী (সা.) একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে তাঁবু খাটিয়ে দিন-রাত সেখানেই থাকতেন। যুবাব মসজিদটি সে জায়গাটিকে এখনও স্মরণ করিয়ে দেয়।

খন্দকের যুদ্ধঃ

মুসলমানগণ দিনরাত পরিশ্রম করে সপ্তাহ কালের মধ্যেই খাল খনন কাজ শেষ করে নগর রক্ষার অন্যান্য কাজে লিপ্ত হলেন। এমন সময় কোরাইশদের বিরাট বাহিনী মদীনার প্রান্তে এসে উপস্থিত হল এবং একটু দূরে দূরে থেকে নগর বেষ্টন করে ফেলল। শত্রুদের আগমনের পূর্বেই স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদেরকে নগরের

www.pathagar.com

একধারে একটি সুরক্ষিত দূর্গে স্থানান্তর করা হয়েছিল। এদিকে অভ্যন্তরীণভাবে মুনাফিকদের দ্বারা বিদ্রোহের একটা আশংকা ছিল আবার ইহুদীদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ও ছিল। মদীনায় বানু কুরায়যা নামক ইহুদীদের একটি গোত্র বসবাস করতো। তাদের সাথে মহানবী (সা.) এর একটা চুক্তি ছিল কিন্তু মুশরিক ইহুদীরা ঐ গোত্রকে তাদের পক্ষ করে নিল আর বানু কুরায়যা মহানবী (সা.) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করলো। সে জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার আগে অভ্যন্ত রীণ বিদ্রোহ নিবারনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি তিন হাজার সৈন্যের মধ্যে পাঁচশত সৈন্য আসলাম এবং যায়িদ নামক দু'জন অভিজ্ঞ সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়ে তাদের অধীনে যথাক্রমে দু'শত ও তিনশত মুসলিম বীরকে নিযুক্ত করলেন। তারা অভ্যন্ত রীণ বিদ্রোহ রক্ষার দায়িত্ব পেলেন। সেনাপতিদের উপদেশ মতে এই পাঁচশত সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে নগরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে এবং আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগলেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে এই কৌশল সাংঘাতিক কার্যকর হল। কারণ মুনাফিকরা মনে করল তাদের চারদিকে অসংখ্য মুসলমান সৈন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে সুতরাং এখন মাথা তুললে আর রক্ষা নেই। তাই তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। অন্য এক মতানুসারে সাল পর্বতের ওপরের এবং তার পেছনের মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়েছিল। তাদেরকে পালাক্রমে নিয়োগ করা হয়েছিল খন্দকের ওপর নজর রেখে সেটিকে পাহারা দেয়ার জন্য। সেই অর্থে এখানে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে শত্রুরা যখনই খন্দক পার হয়ে মদীনা দখলের চেষ্টা করতো তখনই উভয় পক্ষ থেকে তীর ছোঁড়াছুড়ি হতো। কিন্তু মক্কার শত্রুরা এভাবে সুবিধা করতে পারছিল না। সেই অর্থে খন্দকের যুদ্ধে বিনা যুদ্ধেই মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছিল। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "*অ রাদ্দাল্লাহুল লাজীনা কাফারু বিগ্বাইজিহিম লাম ইয়ানালু খাইরা; ওয়া কাফাল্লাহুল মু'মিনীনাল কি্বতাল; ওয়া কানাল্লাহু ক্বাবিয়্যান আযিযা*" অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালা কাফিরদেরকে ক্রোধভরা অন্তরে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। তারা উদ্দেশ্য সাধন করতে পারলো না। আর মুমিনদের তরফ থেকে লড়াই করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী" (সূরা আল আযহাব-২৫)

এখানে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন হল না। যুদ্ধের প্রয়োজন হল না অর্থ হল, যেমন যুদ্ধ হয়েছিল বদরে, যেমন যুদ্ধ হয়েছিল ওহুদে শেষ পর্যন্ত তেমন যুদ্ধ হল না। তবে তারা আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। দিনের পর দিন অতিবাহিত হলেও তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন শত্রুর পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হলো না, মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারলো না তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কোনো প্রকারেই হোক তারা মদীনা আক্রমণ করবেই। 'সাল' পাহাড়ের কাছে পরিখার একটি স্থান অপেক্ষাকৃত

www.pathagar.com

অপ্রশস্ত ছিল। তারা আক্রমণের জন্য সেই স্থানটিকেই নির্বাচিত করলো। আমর, নওফল প্রভৃতির একটা দল তাদের ঘোড়া নিয়ে এবারের চেষ্টায় তারা সফল হলো। তারা পরিখা অতিক্রম করে এপারে এসে পৌছালো। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিল আবদে ওদ্দের পুত্র 'আমর'। আরব লোকদের ধারণা ছিল যে, আমর একাই এক হাজার সৈন্যের সমকক্ষ। আরব বীরদের প্রথা অনুযায়ী আমর হুংকার দিয়ে বলল, 'কে আছ যোদ্ধা? আমার সামনে এসো। হযরত আলী তরবারি উঁচু করে বললেন, 'আমি আছি।' আল্লাহর রাসুল আলীকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। তবে হযরত আলী এবং আমরের সাথে যুদ্ধের আগে যে কথাবার্তা হলো তাতে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় মুসলমানরা কত রক্ষণাত্মক ছিল, কত শান্তি প্রিয় ছিল।

আমর বলল, যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে তিনটি কথা বলে তবে আমি যে কোনো একটি কথা মেনে নিতে বাধ্য হই। হযরত আলী বললেন, ভালো কথা, তুমি তাহলে ইসলাম গ্রহণ কর। আমর বলল, এটা তো কস্মিণকালেও হতে পারে না। হযরত আলী বললেন, তুমি যুদ্ধ করো না, তরবারি গুটিয়ে নিজ গৃহে ফিরে যাও। আমর বলল, আমি কুরাইশ মেয়েদের তিরস্কার শুনতে পারবো না। হযরত আলী বললেন, তাহলে আমার সাথে যুদ্ধ কর।

যুদ্ধ হল এবং আমর প্রথমে হযরত আলী (রাঃ)কে আঘাত করলো। হযরত আলী সে আঘাত ফিরালেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) আঘাত করলেন, আমর দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূপাতিত হল। আমর নিহত হবার পর নওফল, ইকরামা, যিরার, জবায়রা প্রভৃতি সাথিরা সমবেতভাবে হযরত আলী (রাঃ)কে আক্রমণ করলো, কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এর তরবারীর চাকচিক্য দেখে তারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হল। এতে মুসলমানরা খুবই খুশী হলেন এবং তাঁদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে গেল।

বেগতিক দেখে কাফিররা এবার সমবেতভাবে প্রচ আক্রমণ করলো। সারাদিন ধরে তীর এবং পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। ঐদিন রাসুল (সাঃ) এবং সাহাবীগণ এক মুহূর্তের জন্যও পরিখার কাছ থেকে নড়ার সুযোগ পেলেন না। ঐদিনই একাধারে তাঁর চার ওয়াক্ত নামাজ কাযা হল। পরবর্তীতে যে নামাজগুলো তিনি একসাথে পড়লেন। তবে শত্রুরা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারা বুঝলো যে পরিখা ভেদ করে শহরে প্রবেশ করা সম্ভব না।

আবু সুফিয়ান ভেবেছিল যে, মদীনা জয় করতে দু'চারদিনের বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় চলে গেলেও তারা কিছু করতে পারলো না। আবার শীতের প্রকোপ প্রবলভাবে বেড়ে গেল, অন্যদিকে খোলা প্রান্তরে তাদের রসদ শেষ হয়ে আসতে লাগলো। কারণ প্রতিদিন দশ হাজার লোকের খাবারের ব্যবস্থা সহজ ব্যাপার না। এসব কারণে আবু সুফিয়ানের সৈন্যদল একেবারে উৎসাহ হারিয়ে ফেললো।

www.pathagar.com

এমন অবস্থায় মুসলমান সৈনিকেরাও শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য দিনরাত পরিখার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কারণ তাঁরা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসুলের জন্য তাদের জান-মাল, নিজেদেরকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অনাহার, অনিদ্রায় তাঁরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের এ অবস্থা দেখে রাহমাতাল্লিল আলামীন এর কোমল প্রাণ কেঁদে উঠলো। তিনি হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন।

খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যঃ

পয়গম্বরের দু'আ কখনও নিষ্ফল হয় না। অতীতেও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছিল। যেমন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন ফেরেশতা দিয়ে। আল্লাহর রাসুল সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা সে দোয়া কবুল করেছিলেন। সাহাবীরা যুদ্ধের পরে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের ময়দানে এমন কিছু ব্যক্তিকে আমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছি, যাঁদেরকে যুদ্ধের আগেও কখনও দেখিনি এবং যুদ্ধের পরেও কখনও দেখিনি।

ওহুদের যুদ্ধেও সাহায্য এসেছিল। আল্লাহর নবীর নির্দেশ কিছু ব্যক্তি পুরোপুরি পালন না করায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমানরা যখন পরাস্ত হচ্ছিল তখন আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব যুহরী শপথ করে বলেছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দাও, সে আজ আমার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। সে যদি মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে আমার মুক্তি নেই। সে তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দিকে অগ্রসর হতে হতে একেবারে রাসুল (সা.) এর কাছে এসে পড়লো তখন রাসুল (সা.) এর কাছে আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার চোখের উপর পর্দা নিক্ষেপ করেন। যে কারণে সে রাসুলকে (সা.) দেখতে পেল না। কাছে এসেও সে যখন বিফল হয়ে ফিরে গেল তখন শাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি তাকে এ ব্যাপারে বিদ্রুপ করল। তখন সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাইনি।

খন্দকের যুদ্ধের এই অবস্থায় এবারেও আল্লাহর রাসুলের দু'আ নিষ্ফল হলো না। শত্রু শিবিরের শীতের পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। দেখতে দেখতে মরু ঝড় শুরু হয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। শিবিরের আগুন নিভে গেল। চুলোয় চড়ানো হাঁড়িগুলো উল্টিয়ে পড়লো। অন্যান্য উপকরণ ভেঙেচুরে একেবারে ল ভ করে ফেললো। শত্রুদের দুর্গতির আর সীমা রইল না। শীতের মধ্যে তারা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। খাবারের ব্যবস্থা থাকলো না, মাথা গোজার জায়গা থাকলো না। এছাড়া ফেরেশতা দিয়ে তাদের অন্তরে এমন ভীতির সঞ্চার করে দিলেন যে, তারা ভাবতে লাগলো না জানি এই সময় মুসলমানরা যদি আমাদের আক্রমণ করে বসে তাহলে কী হবে! আবু সুফিয়ান এতই ভীত হয়ে পড়লো যে তার

www.pathagar.com

সৈন্যদের রেখে সে একাই মক্কার দিকে রওনা হওয়া শুরু করলো। আবু হুযাইফা বর্ণনা করেন, শত্রুদের অবস্থা দেখে আসার জন্য রাসুল (সা.) কর্তৃক আমি নির্দেশিত হয়েছিলাম। সাহস করে আমি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেখানে গিয়ে আমি বিস্ময়কর অবস্থা দেখলাম। বাতাস চুলোর উপর হতে ডেকচিগুলোকে উল্টিয়ে ফেলেছে। তাঁবুর খুঁটি উৎপাটিত হয়েছে। তারা আগুন জ্বালাতে পারছে না। কোনো কিছুই সজ্জিত অবস্থায় নেই। ঐ সময় আবু সুফিয়ান বলল, হে কুরাইশের দল! আল্লাহর কসম, আমাদের আর কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই। আমাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং আমাদের উটগুলো ধবংস হয়ে গেছে। বানু কুরাইযা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করেছে। আর এই ঝড়ো হাওয়া আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আমরা রান্না করে খেতে পারছি না। তাঁবু ও থাকার স্থান আমরা ঠিক রাখতে পারছি না। তোমরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছো। আমি তো ফিরে যাবার চিন্তা করছি। এ কথা বলেই সে পাশের বসে থাকা উটেই উঠে বসলো। মেজাজ বিগড়ানো এই ধূর্ত মক্কা বাহিনী প্রধান খালিদ বিল ওয়ালিদ এবং আমর ইবনে আসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে ভুললো না। পরদিন শত্রু শিবিরে গিয়ে দেখা গেল শত্রুদের নাম গন্ধ নেই। সেখানে আছে ল ভ কিছু রসদ আর সবকিছুর ভস্মস্তুপ। মুসলমানরা এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। এ অবস্থাটার কথাই পবিত্র কুরআনে সূরা আল আযহাবের ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন *"ইয়া—আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইজজ্বা—আতকুম জুনুদুন ফাআরছালনা আলাইহিম রিহাওয়া জুনুদাললাম তারাওহা; ওয়া কানাল্লাহু বিমা তায়মালুনা বাছিরা।"* অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন বহু সেনাসংঘ তোমাদের উপর চড়াও হয়ে এসেছিল, তখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক সেনাদল (ফেরেশতা) যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ সবকিছু দেখছিলেন যা তোমরা তখন করছিলে।"

তাফসীর ইবনে কাসীর এর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ বলেন, 'আমি এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখোনি।' অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। তাঁরা মুশরিকদের অন্তর ও বুক ভয়, সন্ত্রাস এবং প্রভাব দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাদের সমস্ত নেতা তাদের অধীনস্থ সৈন্যদেরকে কাছে ডেকে ডেকে বলেছিল, 'তোমরা মুক্তির পথ অন্বেষণ কর, বাঁচার পথ বের করে নাও।' এটা ছিল ফেরেশতাদের নিক্ষিপ্ত ভয় ও প্রভাব এবং তাঁরাই ছিলেন ঐ সেনাবাহিনী যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধে সাহায্যের ব্যাপারে বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণনা আছে। জাবির (রা.) বলেন, পরিখার যুদ্ধে আমরা খন্দক খনন করছিলাম। এমন

www.pathagar.com

সময় একটা কঠিন পাথর বের হলো। সাহাবীরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গিয়ে বিষয়টি বললেন। রাসুল (সা.) বললেন আমি নেমে দেখবো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এ সময় ক্ষুধার কারণে তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি কোদাল হাতে নিয়ে পাথরে আঘাত করলেন আর পাথরটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। অতঃপর আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, আমি রাসুল (সা.)কে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব আর একটা ছাগলের বাচ্চা আছে। আমি ছাগলের বাচ্চাটি যবেহ করতে বললাম এবং যব পিশলাম। অতঃপর পাতিলে গোশত চড়িয়ে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অল্প কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে আপনি এবং সাথে এক অথবা দু'জন লোক নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমরা কতজন যাবো? আমি তাঁকে পরিমাণ খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমরা বেশি গেলেই উত্তম হবে। কারণ আল্লাহর রাসুল ক্ষুধার্ত সৈন্যদেরকে কঠোর পরিশ্রমে রেখে একা খেতে যাবেন তা তিনি ভাবতে পারলেন না। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, সকলেই চলো। অতএব, মুহাজির ও আনসার সকলেই রওনা হলো। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এসে বললাম, তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক কেননা সবাই এসেছেন। আমার স্ত্রী (খাবারের পরিমাণ এবং সকলের আগমনে কিছুটা বিচলিত হয়ে) বলল, তিঁনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ করেছেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং সাহাবীদের বললেন, তোমরা প্রবেশ করো কিন্তু ভিড় করো না। তারপর তিনি রুটি টুকরো করতে শুরু করলেন এবং এর উপর গোশত দিতে লাগলেন। আর ডেকচি ও উনুন ঢেকে ফেললেন। তিনি তা থেকে সাহাবীদের কাছে এনে ঢেলে দিলেন। এভাবে রুটি টুকরো করতেই থাকলেন এবং তাতে তরকারী ঢেলে দিতেই থাকলেন। অবশেষে সহস্রাধিক মেহমানদের সকলেই পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেটভরে খেলেন আর কিছু অবশিষ্টও থাকলো। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি [জাবির (রা.)'র স্ত্রী] খাও এবং যাদের ক্ষুধা পেয়েছে তাদের হাদিয়া দাও। এভাবেই আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসুলকে এবং তার প্রিয় বান্দাদেরকে সাহায্য করেছিলেন।

উপসংহার:

হক এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার কারণেই মুসলমানগণ আল্লাহতায়ালার সাহায্য পেয়েছেন। যদিও নেতিবাচক সমালোচকগণ, ইসলামের দুষমনগণ বহুবিধ পন্থায়

www.pathagar.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বলতে চেষ্টা করেছেন এবং আজও বলছেন যে, ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল তরবারীর শক্তিতে। আশা করি, সমালোচকদের এসব কথার জবাব এ গ্রন্থ থেকে কিছুটা হলেও বুঝতে সহায়তা করবে যে ইসলাম তরবারীর জোরে আসেনি। মুসলমানরা যুদ্ধ করেছে অত্যাচারিত হয়ে, আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁরা কখনই আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি, বরং ভূমিকা ছিল রক্ষণাত্মক। আর মক্কাবাসীরা বারবার আক্রমণের চেষ্টা করেছে এবং বারবার ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, তারপরেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাঁরা কখনই যুদ্ধংদেহী ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের আদর্শ দিয়ে মানুষকে জয় করেছে, ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছে। খন্দকের যুদ্ধেও মক্কাবাসী এবং ইহুদীদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যর্থ করে দিয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যকে জয়ী করেছিলেন।

www.pathagar.com

উত্তর

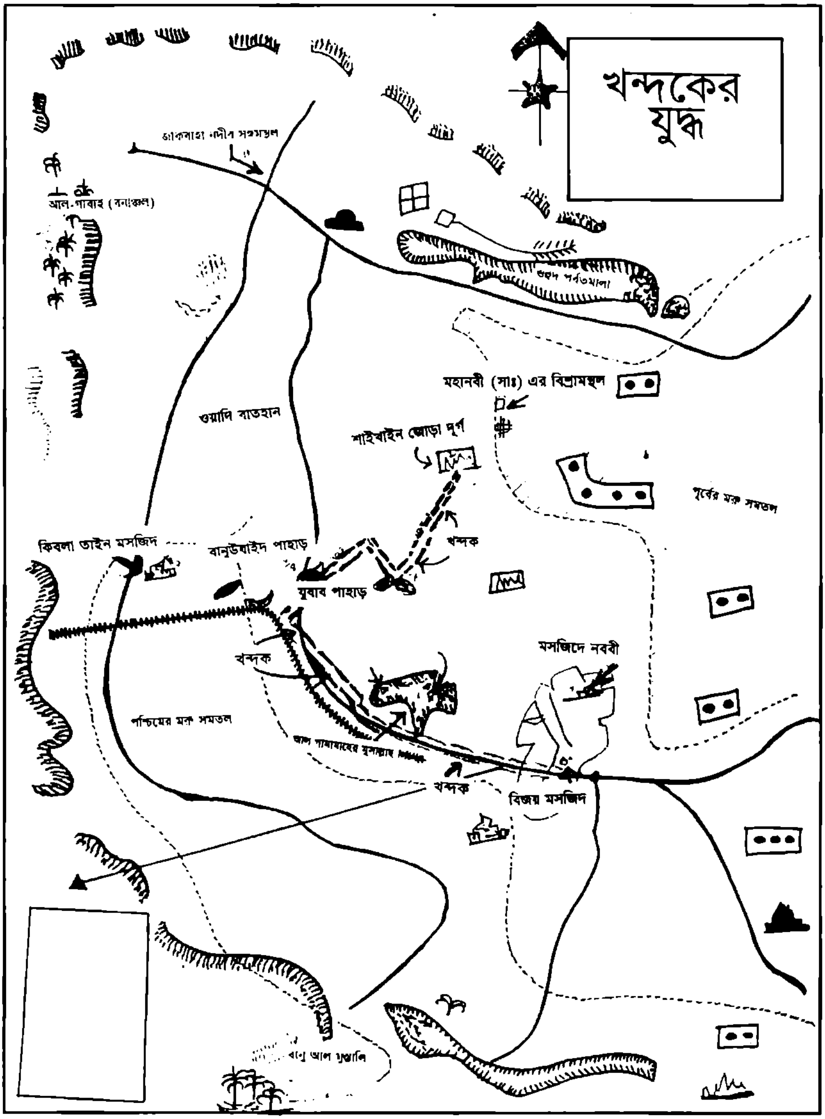

খন্দকের যুদ্ধ
আল-গাবাহ (বনাঞ্চল)
উহুদ পর্বতমালা
মহানবী (সাঃ) এর বিশ্রামস্থল
ওয়াদি বাতহান
শাইখাইন জোড়া দুর্গ
পূর্বের মরু সমতল
কিবলা তাইন মসজিদ
বানুউবাইদ পাহাড়
খন্দক
যুবাব পাহাড়
মসজিদে নববী
খন্দক
পশ্চিমের মরু সমতল
খন্দক
বিজয় মসজিদ

দক্ষিণ

খয়বরের যুদ্ধ

যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরিঃ

খন্দকের যুদ্ধের পর কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের একটা সন্ধি হয়। ইতিহাসে সেটা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। আপাত: দৃষ্টিতে এই সন্ধি মুসলমানদের জন্য কিছুটা অবমাননাকর মনে হতে পারে, সম্মানের সাথে শান্তির পরিবর্তে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে মনে হতে পারে, কিন্তু এটা যে মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়ের জন্য কতটা সহায়ক ছিল তা পরবর্তীতে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রমাণিত হয়। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই সন্ধি ছিলো মুসলমানদের শক্তির স্বীকৃতি এবং এ কথার ঘোষণা যে, এখন আর কোরায়েশদের পক্ষে মুসলমানদের শক্তিকে নস্যাৎ করার সাধ্য নেই। এই সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। যে সন্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল একটি যুদ্ধ জয়ের সাফল্যের চেয়েও অনেক বেশি। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে কিছুটা সময় পেলেন। (পরবর্তীতেও এই বিষয়ের উপরে আরো লেখা আসবে যে রাসুল (সা.) এই সময়ে দূত মারফত পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে, কয়েকটি রাষ্ট্রে চিঠি লিখে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন)। সন্ধির ফলে খন্দক যুদ্ধের ত্রিমুখী শক্তির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কুরাইশদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিন্ত হলেন। অন্য দুটো শাখা ছিল শক্তিশালী ইহুদী এবং নজদ এর কয়েকটি গোত্র। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের সাথেও হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। যাতে সব দিক থেকে নিরাপত্তা লাভ সম্ভব হয়, এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ কায়েম হয় এবং মুসলমানরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাদ দিয়ে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে ভালোভাবে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।

খয়বর ছিল মদীনা শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম কোনে প্রায় নব্বই মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ছিল ইহুদীদের একটা বসতি। খয়বরের ইহুদীরা মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এদিকে মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহুদীরাও খয়বর-এ বসতি স্থাপন করে। ফলে খয়বর ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আখড়া হয়ে উঠেছিল। এই খয়বরের অধিবাসীরাই খন্দকের যুদ্ধে মুশরেকদের সকল দলকে উস্কানী দিয়ে সমবেত করেছিলো। এরাই বনু কুরাইশ গোত্রের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্দীপ্ত

www.pathagar.com

করেছিলো। তারা মদীনা থেকে অনেক দূরে থাকায় নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতো এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতো না। তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত ও বিরক্ত করছিল। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিল। খয়বার এবং সমুদ্রের মধ্যে যে অঞ্চল ছিল সেই অঞ্চলে বসবাস করতো গাতাফান গোত্রের লোকেরা। তারা ইহুদীদের মিত্র ছিল। তারা উভয়ে মিলিত হয়ে একমত হল যে, মুসলমানরা যে পথে মদীনা থেকে সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে সেই পথ বন্ধ করে দেবে। এই পন্থায় মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার ফলে মুসলমানগণ ভীষণভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপায় না দেখে খয়বর এলাকায় ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করার চিন্তা-ভাবনা করলেন। খয়বরের ইহুদীদের এই কাপুরুষোচিত ভূমিকা মহানবীকে বিশৃঙ্খলা ও আশংকার এ কেন্দ্রে আক্রমণ করে তাদের উচ্ছেদ ও নিরস্ত্র করার এ সিদ্ধান্তকে বাধ্য করে। আরও একটি কারণ মহানবী (সা.)কে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বা বাধ্য করেছিল তা হলো, তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের প্রতি মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় পত্র দিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে বিশেষত পারস্য ও রোম সম্রাট ইহুদীদেরকে ব্যবহার করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে এবং ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার চেষ্টা করতে পারে এ আশংকায় তাদের উপর কড়া নজর রাখা এবং তাদেরকে নিরস্ত্র করা প্রয়োজন ছিল। (রাসুল (সা.) এর এই আশংকা পরবর্তিতে সত্যে পরিণত হয়েছিল (যার ফলে মু'তার যুদ্ধ সংঘটিত হয়) তাদের বিরুদ্ধে হয়তো আরও আগেই পদক্ষেপ নেয়া যেত কিন্তু কোরাইশদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল বিধায় এদের দিকে মনোযোগ দেয়া যাচ্ছিল না। সন্ধি স্থাপনের ফলে ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। মুসলমানরা তাদের দিকে মনোযোগী হলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে জিলহজ্জ মাস পুরো এবং মহররম মাসের কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করেন। খয়বর যাত্রাকালে তিনি ঘোষণা করলেন যে, যারা হুদায়বিয়ার অভিযানে যোগ দেয়নি তারা যেন এই অভিযানে যোগদান না করে। এর ফলে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো চৌদ্দশত মতান্তরে ষোলোশত। অন্যদিকে খয়বরে ইহুদীদের বেশ কয়েকটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল। ইহুদীদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাদের প্রধান নেতা কিনানা গাতাফান গোত্রের সাথে সন্ধি করলো যে, তারা যদি সৈন্য পাঠায় তাহলে তাদেরকে সে বছর খয়বরে উৎপন্ন খেজুরের অর্ধেক দেবে। গাতাফান গোত্র চার হাজার সৈন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিল। এতে ইহুদীদের সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো চৌদ্দ হাজার। এ যুদ্ধ অভিযানের কথা গোপন রাখা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাবাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দেয়ার সময় সামরিক কৌশল

www.pathagar.com

হিসেবে বিষয়টি গোপন রাখার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কেউ তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে যেন জানতে না পারে। যেন শত্রুরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ অবরুদ্ধ করা যায়। তিনি এই চৌদ্দশত মুসলমান নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। এই সৈন্যের মধ্যে দুইশত আশ্বারোহী ছিলেন। অবশিষ্ট উষ্ট্রারোহী বা পদাতিক বাহিনী ছিলেন। এ সময় ইহুদীদের সাহায্য করার জন্য মুনাফিকরা যথেষ্ট ছুটোছুটি করলো। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবায় খয়বরে খবর পাঠালো যে, মোহাম্মদ তোমাদের ওদিকে যাচ্ছেন, সতর্ক হয়ে যাও। মোহাম্মদের সঙ্গীদের সংখ্যা বেশি না। তাছাড়া তারা নিঃস্ব, তাদের কাছে যে অস্ত্র রয়েছে তা খুব সামান্য। তোমরা প্রস্তুত হও, ভয় পেওনা, তোমাদের অস্ত্র, সৈন্য অনেক বেশি ইত্যাদি।

আড়াই দিন চলার পর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে আর মাত্র এক সন্ধ্যার বাকী ছিলো। গাতাফান সম্প্রদায় যে খয়বরবাসীদেরকে সাহায্য করতে আসবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদের আগমনে বাধার সৃষ্টি করার জন্য গাতাফান ও খয়বরের মধ্যবর্তী একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাবু গেঁড়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাঁরা এমনই নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন যে, নগরের কেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি বা গৃহপালিত পশুপাখিও কোনোরকম সতর্কতামূলক শব্দ করেনি। ঐ এলাকাবাসী যখন সূর্যের আলো ওঠার পর সকাল বেলা কাজের জন্য বেরিয়ে এলো তখন তারা তাদের সামনে এক নিরব সৈন্য বাহিনীকে দেখে অবাক হলো। তারা দ্রুত তাদের নিজের ঘরে ফিরে গেল এবং সবাইকে খবরটা জানালো। গাতাফান সম্প্রদায় ভাবলো আমরা যদি এখন ইহুদীদেরকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায় আর মুসলমানরা যদি আমাদের পল্লীতেই আক্রমন করে বসে তাহলে সর্বনাশ। এ জন্য যে চার হাজার সৈন্য গাতাফান সম্প্রদায় থেকে ইহুদীদের কাছে আসার কথা ছিল, তারা না গিয়ে নিজেদের পল্লী রক্ষার জন্য ফিরে গেল।

ইহুদীরা খুব দ্রুত একটা সমরসভা আহ্বান করলো। তারা নিজেদের প্রাচীরের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ চালাবার সিদ্ধান্ত নিল। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের এ সিদ্ধান্তের ফলে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। খয়বরের জনবসতি ছিল দুইভাগে বিভক্ত। একভাগে ছিল পাঁচটি দুর্গ। দুর্গগুলোর নাম হলঃ এক. হেছনে নায়েম, দুই. হেছনে মা'স, তিন. হেছনে কিল্লা যোবায়ের, চার. হেছনে উবাই, পাঁচ. হেছনে নাজার। এই পাঁচটি দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটি দুর্গ সংবলিত এলাকাকে নাজাত বলা হয়। অন্য দুটো দুর্গ সংবলিত এলাকাকে বলা হয় শির্ক।

খয়বরের দ্বিতীয় ভাগের জনবসতি কোতায়রা নামে পরিচিত ছিল। এর মধ্যে ছিল তিনটি দুর্গ। এক. হেছনে কামুস, দুই. হেছনে অতীহ এবং তিন. হেছনে সালালেম। খয়বরের কোনো কোনো দুর্গ যখন যে সেনাপতির অধীনে ছিল তখন তার

www.pathagar.com

নামে অভিহিত করা হয়েছিল। তবে খয়বরের এই আটটি দুর্গ ছাড়াও আরও কয়েকটি দুর্গ এবং ভবন ছিল যেগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন সুরক্ষিত ছিল না। এ কারণে প্রথম ভাগের দুর্গগুলোতেই যুদ্ধ হয়েছে, অন্যান্য দুর্গে যোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বিনা যুদ্ধেই সেগুলো মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল।

নায়েম দুর্গ বিজয়:

একটু আগে যে ৮টি দুর্গের নাম উল্লেখ করা হল, এর মধ্যে সর্বপ্রথম হামলা করা হয় নায়েম দুর্গের ওপর। অবস্থানগত কারণে এটিকে ইহুদীদের প্রথম লাইনের প্রতিরক্ষাব্যূহ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব যে ব্যক্তি আল্লাহপাক এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসে। সকালে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের সামনে উপস্থিত হলেন। সকলেই মনে মনে পতাকা পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলী ইবনে আবু তালেব কোথায়? সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল তার চোখ উঠেছে। আল্লাহর রাসূল বললেন, তাকে নিয়ে এসো। হযরত আলীকে (রা.) নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার চোখে সামান্য থুতু লাগিয়ে দোয়া করলেন। হযরত আলী (রা.) এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যে, মনেই হলো না যে তাঁর চোখে কোনো সমস্যা ছিল। এরপর হযরত আলী (রা.) কে পতাকা দেয়া হল। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন যাও, ওদেরকে প্রথমে ইসলামের আহ্বান জানাও। যদি তোমার মাধ্যমে আল্লাহ পাক ওদের একজনকেও হেদায়েত দেন তবে তোমার জন্য সেটা হবে বহু সংখ্যক লাল উটের চেয়ে উত্তম। (উল্লেখ করতে হয় যে, আরবরা লাল বর্ণের উটকে অমূল্য রত্ন মনে করতো। বুখারী শরীফের হাদীসে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বললেন কারণ যুদ্ধ করা তাঁর ইচ্ছা নয় বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরেই তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) মুসলমান সৈন্যদের সাথে নিয়ে এ দুর্গের সামনে গেলেন এবং ইহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। নিজেদের বাদশা মারহাবের নেতৃত্বে তারা মুসলমানদের মোকাবিলায় এসে দাঁড়ালো। মারহাব ছিল ইহুদীদের একজন অন্যতম বিখ্যাত বীর। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এর কাছে এই বীর পরাস্ত হল, নিহত হল। ইহুদী বীরের এই করুণ দশা দেখে তার সহযোগী সৈন্যরা ভয়ে পালাতে শুরু করল ফলে অপরাজেয় এই দুর্গটি মুসলমানদের হস্তগত হল। তবে বর্ণনা মতে এ দুর্গ জয় করতে কয়েকদিন ব্যাপী যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং মুসলমানদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

খয়বরের যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়া একটু অসম্ভব। তবে ইতিহাস এবং জীবনীগ্রন্থ থেকে মোটামুটিভাবে জানা যায়, মুসলমান সৈন্যরা একটি একটি করে দুর্গ দখলে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তারা চেষ্টা করতেন, যে দুর্গে আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে তা থেকে অন্য দুর্গগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে। এভাবে একটি দুর্গের পতন হলে আরেকটি দুর্গ আক্রমণ করতেন। কিন্তু যে দুর্গগুলো মাটির নিচ দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং যে দুর্গগুলোর অভ্যন্তরে সৈন্যরা কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতো সেগুলোর দখল প্রক্রিয়া বেশ ধীর গতিসম্পন্ন হতো। কিন্তু যে দুর্গগুলোর সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হতো বা অন্য দুর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো, সেগুলোর পতন সহজেই হতো। সে ক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনাও কম ঘটতো।

সায়াব ইবনে মোয়াজ দুর্গ জয়ঃ

নায়েম দুর্গ জয়ের পর সায়াব দুর্গ ছিল নিরাপত্তা ও শক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুসলমানরা হোবাব ইবনে মুনযের আনসারীর (রা.) নেতৃত্বে এ দুর্গে হামলা করেন এবং তিনদিন যাবত অবরোধ করে রাখেন। তৃতীয় দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দুর্গ জয়ের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। দোয়ার পর সাহাবারা হামলা করলেন এবং আল্লাহতায়ালা অধিক খাদ্যদ্রব্য সংবলিত মা'য দুর্গ জয়ের গৌরব মুসলমানদের দান করলেন।

যোবায়ের দুর্গ জয়ঃ

খয়বরের আরেকটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল জুবায়ের-এর দুর্গ। এ দুর্গের উঁচু চূড়া ছিল পাথরের। ঐ দুর্গের চারপাশে ছিল উঁচু পাহাড়। অন্যান্য দুর্গ থেকে যেসব যোদ্ধা পালিয়ে এসেছিলো তারা প্রায় সবাই এই দুর্গের সৈন্যদলে এসে যোগ দেয়। চারদিক থেকে দেয়াল ঘেরা স্থানে তাদের অবস্থান ছিল দৃঢ়। এ দুর্গে ওঠার পথ ছিল খুবই বন্ধুর। কোনো সওয়ারী নিয়ে ওঠাতো সম্ভবই ছিল না, পায়ে হেঁটে ওঠাও ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। মহানবী (সা.) তিন দিন ধরে ঐ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। তখন অন্য এক দুর্গ থেকে এক ইহুদী তাঁর কাছে এসে তার জীবন, সম্পত্তি এবং পরিবারের নিরাপত্তা প্রদানের শর্তে একটি গোপন তথ্য জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করে। মহানবী (সা.) তাকে সেই সুযোগ দিতে সম্মতি প্রকাশ করলে সে মহানবী (সা.)কে বলল যে, এই দুর্গে একটি গোপন সম্পদ আছে যা তাদের অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তারা আপনাদের এ অবরোধকে পরোয়া করবে না। সেটি হল মাটির নিচ দিয়ে প্রবাহিত একটি পানির ঝরনা। তারা রাতে এসে পানি পান করে এবং সারাদিনের প্রয়োজনীয় পানি তুলে নিয়ে যায়। আপনি যদি এই পানিটা বন্ধ করতে পারেন তাহলে তারা নত হবে। এই পানির ধারাটি বন্ধ করে দিলে তারা পানির

www.pathagar.com

অভাবে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। সে অনুযায়ী পানির ধারাটি বন্ধ করা হয় এবং তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভয়ানক এক যুদ্ধের পর কয়েকজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করলেন এবং প্রায় দশজন ইহুদী নিহত হলো এবং তারা পরাজিত হলো।

উবাই এবং নেজার দুর্গ জয়ঃ

যোবায়ের দুর্গের পতনের পর ইহুদীরা উবাই দুর্গে গিয়ে সমবেত হয়। মুসলমানরা সেই দুর্গও অবরোধ করেন। সেখানে দুই জন শক্তিগর্বে গর্বিত ইহুদী প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার আহ্বান জানায়। তাদেরকে পরাস্ত করে সাহাবারা দুর্গের ভেতরে গিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ইহুদীরা দুর্গ থেকে সরে যেতে শুরু করে এবং সেখান থেকে নেজার দুর্গে সমবেত হয়।

নেজার দুর্গটিও ছিল সুরক্ষিত ও নিরাপদ। ইহুদীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও এ দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। এ কারণে তারা নিজেদের নারী ও শিশুদেরকে এখানে সমবেত করেছিল। মুসলমানরা এ দুর্গে কঠোর অবরোধ করেন এবং ইহুদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। উঁচু পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত এ দুর্গে প্রবেশে মুসলমানরা সুবিধা করতে পারলেন না। আবার ইহুদীরাও বেরিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার সাহস পাচ্ছিল না। তারা উপর থেকে তীর আর পাথর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল। এ দুর্গ জয় কঠিন হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এখানে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের নির্দেশ দেন। মুসলমানরা এ দুর্গে কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করেন ফলে দুর্গের দেয়ালে ছিদ্র হয়ে যায়। সেই ছিদ্র দিয়ে মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করেন এবং তুমূল যুদ্ধ হয়। ইহুদীরা এখানে পরাজিত হয় এবং অন্যান্য দুর্গের মতোই এ দুর্গ থেকেও তারা সটকে পড়ে। তারা তাদের নারী এবং শিশুদেরকে মুসলমানদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে।

সন্ধির আলোচনাঃ

এভাবেই মুসলমানরা একের পর এক দুর্গ জয় করতে থাকায় প্রথমে ইবনে আবুল হাকিক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে পয়গাম পাঠায় যে, আমি কি আপনার কাছে এসে কথা বলতে পারি?। আল্লাহর রাসূল অনুমতি দিলেন। আবুল হাকিক প্রস্তাব পেশ করেন যে, দুর্গে যে সকল সৈন্য রয়েছে তাদের এবং তাদের পরিজনের প্রাণ ভিক্ষার বিনিময়ে তারা নিজেদের অর্থ সম্পদ সোনা-রূপা, জায়গা-জমি, ঘোড়া, বর্ম ইত্যাদি সব কিছু আল্লাহর রাসূলের কাছে অর্পন করবে। তারা শুধু পরিধানের পোশাক নিয়ে বেরিয়ে যাবে। এ প্রস্তাব মেনে নেয়া হয় এবং খয়বরের জয় চূড়ান্তরূপ লাভ করে।

www.pathagar.com

অন্য বর্ণনায় আছে, ইহুদীরা এসে রাসূলের কাছে মিনতি সহকারে জানায় যে, আপনি এই এলাকাতে আমাদেরকেই চাষ-বাস করার অনুমতি প্রদান করুন যেহেতু আমরা এই এলাকার চাষ-বাস কৌশল ভালো জানি, অন্যরা তা জানে না। আর আমাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক আপনাকে প্রদান করবো আর অর্ধেক আমরা নেব আমাদের পরিশ্রমের ফসল হিসেবে। রাসূল (সা.) এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললেন, এই সিদ্ধান্ত ততদিন বলবৎ থাকবে, যতদিন বিশ্বাসীগণ এ সিদ্ধান্ত বদলানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করবেন। অর্থাৎ এভাবেই খয়বর মুসলমানদের দখলে আসে।

সংকটময় মুহূর্তেও চরম আত্মসংযম:

খয়বরের যুদ্ধ দীর্ঘ সময় হওয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। এ সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাখাল যে ইহুদীদের দুম্বাগুলো দেখাশুনা করত সে রাসূলের কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইল। মহানবী (সা.) তাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বললেন। এতে সে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। সে মহানবীকে বলল, এ দুম্বাগুলো আমার তত্ত্বাবধানে আমানত হিসেবে রয়েছে। এখন তো তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন, তাই এগুলো আপনি নিতে পারেন। মহানবী (সা.) সহস্রাধিক ক্ষুধার্ত সৈনিকের সামনে সুস্পষ্টভাবে বললেন, আমাদের ধর্মে আমানতের খেয়ানত করা বড় অপরাধ ও গুনাহ। তোমার দায়িত্ব হলো, দুম্বাগুলো মালিকের কাছে গিয়ে ফিরিয়ে দেয়া। সে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলো। সেগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এসে রাসূলের সৈন্যদলে যোগ দিল এবং অবশেষে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হলো। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, মহানবী (সা.) যে যৌবনে 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী উপাধি লাভ করেছিলেন সারাজীবনই তিনি সেই বিশ্বাসী ছিলেন। যে কারণেই যুদ্ধ চলাকালেও, মুসলমানরা ক্ষুধার্ত অবস্থাতেও এসব দুর্গ থেকে রাখালরা মেষ পাল নিয়ে সবুজ মাঠে যেত এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসতো কিন্তু কোনো মুসলমান সেগুলো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতো না। কারণ তাঁরা তাঁদের নেতার প্রশিক্ষণে ইসলামের মহান শিক্ষার ছায়ায় বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসেবে তৈরি হয়েছিলেন।

বিজয়ের কারণ:

১। সঠিক পরিকল্পনা ও উপযুক্ত সামরিক কৌশল গ্রহণ: মুসলিম বাহিনী এমন এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যাতে ইহুদী ও তাদের সহযোগী গোত্রগুলো (যেমন গাতাফান) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর নিজেদের আবাসভূমি থেকে বের হয় নি। এছাড়া গাতাফান গোত্রের কেউ কেউ মুসলমান

www.pathagar.com

হয়েছিল কিন্তু নিজেদেরকে তারা কাফের বলেই পরিচয় দিত এবং দক্ষতার সাথেই এমন গুজব রটিয়েছিল যেন তারা ইহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে না পারে। এ জাতীয় ঘটনা পূর্বে খন্দকের যুদ্ধেও হয়েছিল।

২। শত্রুদের অভ্যন্তর থেকে তথ্য লাভঃ মহানবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনি খয়বর অবরোধের পূর্বেই 'ইবাদ ইবনে বাশার' নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিশ জনকে খয়বর অভিমুখে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। তারা খয়বরের নিকটবর্তী একটা স্থানে এক ইহুদীর সাথে দেখা পেল এবং কথাবার্তায় বুঝতে পারলো যে সে একজন ইহুদী গুপ্তচর। তাকে ধরে এনে রাসূলের সামনে উপস্থিত করা হল। তাকে হত্যার হুমকী দেয়ার পর সে অনেক তথ্য ফাঁস করে দিল। যুদ্ধের সময়ও একজন মুসলমান প্রহরী একজন ইহুদীকে গ্রেফতার করে মহানবীর কাছে নিয়ে এলো। সেই ইহুদী নিজের প্রাণ এবং সম্পদ রক্ষার শর্তে ইহুদীদের অবস্থান এবং অন্যান্য তথ্য দিতে রাজী হল। তাকে সেই সুযোগ দেয়া হলে সে ইহুদীদের সামরিক অবস্থানসহ তাদের অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানও দিল যা মুসলমানদেরকে জয়ী হতে সাহায্য করে।

৩। হযরত আলীর (র.) এর আত্মত্যাগ ও অতুলনীয় বীরত্ব এবং আল্লাহতায়ার সাহায্যঃ এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) বলেছেন: "আমরা ইহুদীদের শক্তিশালী বাহিনী ও লৌহ কঠিন দুর্গের মোকাবিলায় দাঁড়ালাম। তাদের যোদ্ধারা প্রতিদিন দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধের আহ্বান জানাত এবং মুসলমানদের অনেকেই তাদের হাতে নিহত হতো। একদিন মহানবী (সা.) আমাকে দুর্গ অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। আমি তাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মুখোমুখি হলাম। তাদের অনেককেই হত্যা করলাম এবং একদল পালিয়ে গেল। তারা দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আমি দুর্গের দরজা উপড়ে ফেলে একাকী ভেতরে প্রবেশ করলাম। কেউ আর আমার সামনে এগিয়ে এলো না। এ পথে আল্লাহ ছাড়া কেউই আমাকে সাহায্য করে নি।"

বিজয়ের ফলাফলঃ খয়বরের বিজয়ের ফলে বিশ্বাসীদের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা হয়েছিল। খয়বরে প্রাপ্ত গনীমতের মালের প্রাচুর্যের বিবরণ বোখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। মারবি ইবনে ওমর (রা.) বলেন, খয়বর জয়ের আগ পর্যন্ত আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, খয়বর বিজয়ের পর আমরা বলাবলি করলাম যে, এখন থেকে আমরা পেটভরে খেজুর খেতে পারবো।

মৃতের সংখ্যাঃ এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে শাহাদাত বরণের সংখ্যা নিয়ে একটু মতবিরোধ রয়েছে। বর্ণনা অনুযায়ী কারো মতে ১৬ জন, কারো মতে ১৮ জন এবং কারো মতে ২০ জনের মত শহীদ হয়েছিলেন। অপরপক্ষে ইহুদীদের নিহতের সংখ্যা ৯৩ জন।

www.pathagar.com

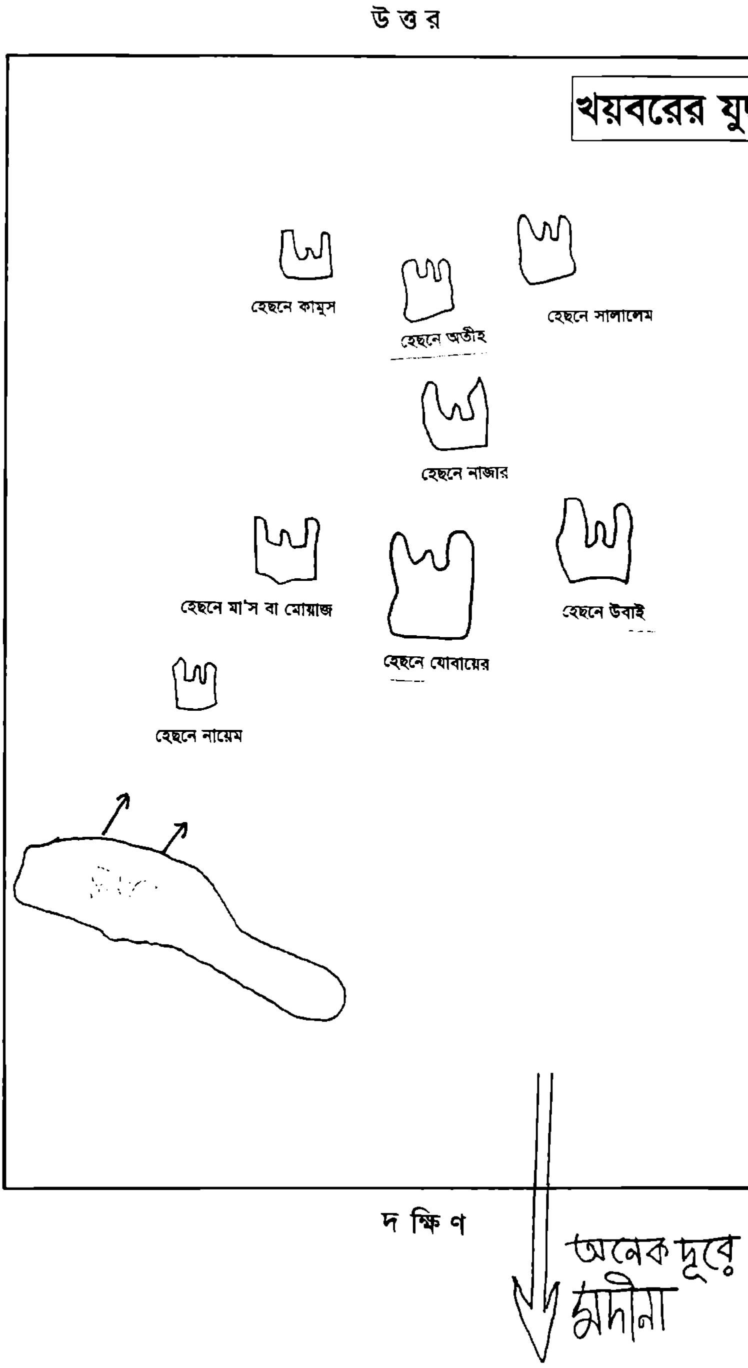

www.pathagar.com

মু'তার যুদ্ধ

ভূমিকাঃ

মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় মুসলমানরা যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলোর মধ্যে এটা ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধ হয় খৃষ্টানদের সাথে। এ যুদ্ধই খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশসমূহ জয়ের পথ খুলে দেয়।

যুদ্ধের কারণঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ দাওয়াতপত্রগুলো এক এক স্থানে এক এক দূতের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। খয়বরের যুদ্ধে ইহুদীদের পরাজয়ের পর আরবের আরো অনেক বড় বড় অংশ মহানবী (সা.) এর পতাকাতলে পরিপূর্ণভাবে চলে এলো। অনেকে ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য উদগ্রীব হলো। নবীজী (সা.) দূত মারফত যে পত্র পাঠিয়েছিলেন সেই বার্তা পেয়ে বাহরাইনের রাজা আল্-মুনধীর এবং ইয়েমের পার্শী গভর্নর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। মিশরের আল মুকাকাস মহানবী (সা.)কে বহু মূল্যবান উপহার প্রেরণ করলেন। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসি খুবই ভদ্রচিত ও মার্জিত ভাষায় মহানবী (সা.) এর পত্রের উত্তর দিলেন।

অপরপক্ষে আরবের একজন নিরক্ষর লোক ধর্মের আহ্বান জানাচ্ছে, যীশুকে মানব সন্তান বলে প্রচার করছে, এতবড় ধৃষ্টতা খৃষ্টানদের অনেকেরই সহ্য হলো না। পারস্যের রাজা খসরু প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি পত্র লেখার জন্য নবীজীকে (সা.) শাস্তি দিবেন। তার এই মনোভাবের শাস্তি আল্লাহই তাকে দিলেন। তার পুত্র সিরু তাকে হত্যা করলো এবং সিংহাসন দখল করলো। আবু সামারের পুত্র আল হারিখ নবীজীর (সা.) পত্র পেয়ে তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তার এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তার রাজ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন। মুতার যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে সেটা হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) হারিস ইবনে ওমায়ের আযদীকে এমনি একটি চিঠিসহ বসরার গবর্ণরের কাছে পাঠালেন। সে সময় সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি ছিল রোমান

www.pathagar.com

সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হারিস ইবনে আবি মিশর গাস্‌সানি। মহানবীর (সা.) এর দূত সীমান্তবর্তী নগরে প্রবেশ করলে সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা সুরাহবিল দূতের আগমনের কথা শুনে তাকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে দূত বলেন, তিনি মহানবী (সা.) এর দূত। তিনি শাসনকর্তা হারিস আল গাসসানির কাছে মহানবীর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তাবাহক। অথচ এটা শোনার পরেও সীমান্ত এলাকায় শাসনকর্তার আদেশে এই দূতকে হাত পা বেঁধে হত্যা করা হয়। অথচ নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত বা সাধারণ দূতকে হত্যা করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। এটা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এমনকি এর চেয়েও গুরুতর অপরাধ মনে করা হয়। এ ধরণের অন্যায় সংঘটিত হবার পরও রোম সরকারের উচিত ছিল অনুতপ্ত হওয়া, কিন্তু অনুতপ্ত হওয়াতো দূরের কথা, মুসলমানরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে ভেবে তারা সুরাহবিলের এলাকায় সৈন্য প্রেরণ করলো। অপরাধ সংঘটিত করে ভয়ে ভয়ে ছিল সুরাহবিল। তাই সে তার রাজ্যের আশেপাশের আরবদের আহ্বান করে একত্রিত করতে চাইলো। যাদেরকে সে আহ্বান জানালো তারা হলো বানু বাহরা গোত্র, বানু লাখম গোত্র, বালিয়া গোত্র এবং অন্যান্য আরও গোত্র। হিরাক্লিয়াসের সেনাপতি থিওডোরাস সুরাহবিলের ভয়ের কথা জানতে পেরে সহযোগিতা করলো। থিওডোরাসের সহায়তায় মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে তারা প্রায় এক লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করলো।

আল্লাহর রাসূল তাঁর প্রেরিত দূতের হত্যার খবর পেয়ে খুব মর্মাহত হলেন। তিনি তাদের এই কাপুরুষোচিত কার্যকলাপ সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত করলেন এবং সেই এলাকায় মোতায়েনের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী তিন হাজার সৈন্য প্রস্তুত করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) খৃষ্টানদের সাথে এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি মুতা অভিমুখে তিন হাজার সৈন্যের একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। এই অভিযানের প্রধান সেনাপতি হলেন হযরত যায়দ ইবনে হারিসা। এই যায়দ হলেন সেই ক্রীতদাস, যাঁকে রাসূল (সা.) পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিন হাজার সম্ভ্রান্ত বংশীয় মোহাজের ও আনসারের নেতা হলেন একজন ক্রীতদাস। হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব, অভিজাত আনসারী কবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, প্রসিদ্ধ বীর হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এরকম বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অভিযানে যোগ দেন। কিন্তু সবার শীর্ষে স্থান লাভ করলেন ক্রীতদাস হযরত যায়দ (রা.)। এতে কারো কারো মনে আপত্তির ভাব হয়েছিল কিন্তু ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর ব্যাখ্যা শোনার পর সকলেই সেটা হাসি মুখে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এখানে অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয় যে, সে যুগে দাসকে একটা পশুর চাইতে বেশি মর্যাদা দেয়া হতো না, সেই সময় তিন হাজার অভিজাত সৈন্যের সেনাপতিত্ব তাঁকে প্রদান করে যে সাম্যবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো তা ইসলাম

www.pathagar.com

ছাড়া অন্য কোথাও কল্পনা করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেনা ছাউনিতে এলেন এবং সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি যায়দ শহীদ হয়ে যায় তবে জা'ফর সেনাপতি হবে। যদি জা'ফর শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে। যদি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও শহীদ হয় তবে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্য হতে তাদের সেনাপতি নির্বাচিত করে নিবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এই বাণীতে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, এই তিন জন সেনাপতিই শহীদ হবে, এরপর সৈন্যদের নির্বাচিত চতুর্থ সেনাপতির নেতৃত্বে মুসলমানগণ জয়লাভ করবে।

হযরত যায়দ তিন হাজার মুসলিম বীর নিয়ে মুতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। যদিও হারিস ইবনে উমায়রকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল, তথাপি ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) উপদেশ দিয়ে বললেন: তোমরা সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের আহ্বান জানিও। যদি তারা এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে আর যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর তা না হলে, মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহর নামে জিহাদ করবে। যারা সংসার বিরাগী অর্থাৎ যেসব সন্যাসী সমাজের কোলাহল থেকে বিমুখ হয়ে আশ্রম ও উপাসনালয়ে বসবাস করছে তাদের ওপর চড়াও হবে না। মহিলা, শিশু ও যুদ্ধে অক্ষম বৃদ্ধগণকে হত্যা করবে না। কখনো তোমরা কোনো খেজুর গাছ কাটবে না এবং কোনো ঘড়-বাড়ি ধবংস করবে না।

এই সমস্ত উপদেশ দিতে দিতে বিদা পর্বত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিযাত্রীদের সাথে থাকলেন। এরপর মুসলমানদের সুস্থ্য দেহে বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করে তিনি ফিরে আসলেন।

মুসলিম বাহিনীর সংকট:

হযরত যায়দ সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়া সীমান্তে উপস্থিত হওয়া মাত্রই শুনতে পেলেন বলকার অন্তর্গত ম'আব অঞ্চলে স্বয়ং রোম সম্রাট তার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য অপেক্ষা করছে। এছাড়াও আরব গোত্রের খৃষ্টানগণও তাদের সৈন্য নিয়ে সম্রাটের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। যাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। এ সংবাদে মুসলমানরা একটু দমে গেলেন। কারণ হলো, এক লক্ষ সুসজ্জিত শত্রুর মোকাবিলায় মাত্র তিন হাজার সৈন্য। মুসলমানরা এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে বসলেন। দুই রাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, অবস্থা যখন এমন জটিল তখন মদীনায় সংবাদ পাঠিয়ে এ পরিস্থিতি সম্পর্কে মহানবী (সা.)কে অবহিত করা প্রয়োজন। এরপর তিনি হয়তো বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোনো নির্দেশ দেবেন, সেই অনুযায়ী নির্দেশ পালন করা যাবে।

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদাত যার জন্য আপনারা বেরিয়েছেন। মনে রাখবেন, শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবিলার মাপকাঠি সৈন্যদল, শক্তি এবং সংখ্যাধিক্যের নিরিখে বিচার্য নয়। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই অধিক জনবল ও অস্ত্র নিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করিনি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে ঈমান দান করে সম্মানিত করেছেন, সেই ঈমানের আলোকে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতাম ও মুখোমুখি হতাম। কাজেই সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। আপনারা স্মরণ করুন, বদরের যুদ্ধে মাত্র দুটি ঘোড়া এবং ওহুদের যুদ্ধে মাত্র একটি ঘোড়ার চেয়ে বেশি কিছু আমাদের ছিল না। এ যুদ্ধেও আমাদের দু'টি পরিণতি বা দুটি কল্যাণের মধ্যে অবশ্যই একটি লাভ করবো। হয় আমরা জয়লাভ করবো নতুন শাহাদত বরণ করবো। রওয়াহা (রা.) এর এই ঘোষণায় মুসলমানদের প্রেরণা বৃদ্ধি পেল।

মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা:

মাআন নামক এলাকায় দুই রাত অতিবাহিত করার পর মুসলিম বাহিনী শত্রুদের প্রতি অগ্রসর হলেন। বলকার মাশারেফ নামক জায়গায় তারা হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। শত্রুরা আরো এগিয়ে এলে মুসলমানরা মুতা নামক জায়গায় গিয়ে সমবেত হন। এরপর যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদের বিন্যস্ত করা হয়।

মুসলিম সেনা নায়কদের শাহাদাত:

মুতা নামক জায়গায় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এক লাখ সৈন্যের সাথে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্যের এক বিস্ময়কর অসম যুদ্ধ। ইসলামী সেনাদলের প্রথম অধিনায়ক যায়দ পতাকা গ্রহণ করেন। অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এরপর পতাকা তুলে নেন জাফর ইবনে আবু তালিব। তিনি প্রাণপণ আক্রমণ চালান এবং প্রচ যুদ্ধে লিপ্ত হন। শত্রুদের ওপর ক্রমাগত আঘাত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে শত্রুদের আঘাতে তাঁর ডানহাত কেটে গেলে তিনি বাম হাতে যুদ্ধ শুরু করেন। এরপর তাঁর বাম হাতও কেটে ফেলা হয়। এ পর্যায়ে তিনি দুই বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা বুকের সাথে জড়িয়ে রাখেন। শাহাদত বরণ করা পর্যন্ত তিনি এভাবেই পতাকা ধরে রেখেছিলেন।

হযরত জাফর (রা.) এর বীরত্বপূর্ণ শাহাদতের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) পতাকা গ্রহণ করেন এবং সামনে অগ্রসর হন, যুদ্ধ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন।

www.pathagar.com

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সেনাপতিঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহার (রা.) শাহাদতের পর একজন সাহাবী পতাকা হাতে নিয়ে বললেন, হে মুসলমানরা তোমরা একজন উপযুক্ত সেনাপতিকে দায়িত্ব দাও। এ সময় ইসলামের অন্যতম বীর সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে সেনাপতি নির্বাচন করা হলো। তিনি যখন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন, সেটি ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল মুহূর্ত। তখন মুসলিম বাহিনীর ওপর ভয়-ভীতি প্রভাব বিস্তার করেছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এর হাতে নেতৃত্ব যাওয়ার সাথে সাথেই একটা পরিবর্তন দেখা দিল। কোনো এক অদৃশ্য শক্তিবলে মুসলমানরা যেন শক্তিমান হয়ে উঠলেন। সেনাপতি পতাকা গ্রহণের পর তুমূল যুদ্ধ হয়। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুতার যুদ্ধের দিনে আমার হাতে ৯টি তলোয়ার ভেঙেছে। এরপর আমার হাতে একটি ইয়েমেনী ছোট তলোয়ার অবশিষ্ট ছিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) রণক্ষেত্রের খবর কোনো দূত ছাড়াই পেয়ে যান। তিনি বলেন, যায়েদ পতাকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি শহীদ হন। এরপর জাফর পতাকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা পতাকা গ্রহণ করেছিলেন তিনিও শহীদ হন। আল্লাহর রাসূলের চোখে এ সময় পানি চলে আসে। তিনি বলেন, এরপর পতাকা গ্রহণ করেন আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি তলোয়ার। তাঁর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ পাক মুসলমানদের জয়যুক্ত করেন।

যুদ্ধের সমাপ্তিঃ

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এ সময় এমন এমন সামরিক কৌশল অবলম্বন করলেন যার কোনো পূর্ব নযীর ছিল না। তাঁর কৌশলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মুসলমানদেরকে তিনি পিছিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ কোনো অবস্থায়ই যেন রোমকরা মুসলমানদের ধাওয়া করতে না পারে সেটা তাঁর লক্ষ্য ছিল। পরদিন মাঝরাতে হযরত খালিদ (রা.) সেনাদল রদবদল করে বিন্যাস্ত করলেন। প্রচ শোরগোল করে সৈন্যদের স্থান পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ ডানদিকের সৈন্যদেরকে বাম দিকে আর বাম দিকের সৈন্যদেরকে ডানদিকে মোতায়েন করেন। পেছনের সৈন্যকে সামনে আর সামনের সৈন্যকে পেছনে নিয়ে গেলেন। এভাবে সৈন্য বিন্যাস্ত করে মুসলমানদেরকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে নিলেন। রোমক সৈন্যরা পরের দিন মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেল না। তারা বলাবলি করলো যে, মুসলমানরা সহায়ক সৈন্য পেয়েছে। তাদের শক্তি আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা যখন সাহায্যকারী ছাড়াই এই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে যে অতুলনীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে তখন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মনোবল, সাহসিকতা, অবিচলতা বহুগুণ

www.pathagar.com

বেড়ে যাবে। মুসলমানদের পিছিয়ে যাওয়াটাকে তারা ধোকা মনে করলো। তারা মনে করলো মুসলমানরা ধোকা দিয়ে তাদেরকে সেদিকে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করছে। গেলেই মরূপ্রান্তরে পাল্টা আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করবে। এসব চিন্তা থেকে তৎকালীন বিশ্বসেরা রোমক শক্তি নিজেদের এলাকায় ফিরে গেল। আর মুসলমানরাও মদীনায় ফিরে এলেন।

এখানে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের হৈচৈ করে সৈন্য পরিবর্তন করার এই কৌশলে খৃষ্টানরা ভীত হয়ে পড়লো। তারা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিল। তাহলে এটি কি উদাহরণ নয় যে, সকলকে হত্যা না করেও জয়ী হওয়া যায়? ব্যাপক রক্তপাত না ঘটিয়েও জয়ী হওয়া যায়? অবশ্যই এটি একটি উদাহরণ। যেমন ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সীমান্তেও এটা বহুবার ঘটেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকান মরুভূমিতে বহুবার ঘটেছে, নেপলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়েছিল তখন হয়েছে, ইদানিংকালে এটি সর্বজনভাবে গৃহীত একটি কৌশল যে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন একটি ভান করতে হবে, এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যার মাধ্যমে শত্রু যেন প্রতিপক্ষের আসল সংখ্যা, আসল দিক নির্দেশনা, আসল চলাচলের গতিবিধি যেন বুঝতে না পারে। তাই ইংরেজীতে শব্দগুলো এসেছে ডিসেপশন, প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি। এগুলো যুদ্ধের কৌশল হিসেবে স্বীকৃত। যে কৌশল ব্যবহার করলেন মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী। তারা শত্রুর মনে এই ধারণা ২৪সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন যে, তারা অগ্রসর হতে গেলেই ফাঁদে পড়বে, বিপদে পড়বে। এটাই ছিল মুসলমানদের সবচাইতে বড় সফলতা। অর্থাৎ যুদ্ধ কিন্তু দুই জায়গায় হয়। এক হল শত্রুর মনে, আরেকটা হয় যুদ্ধের ময়দানে। যুদ্ধে মনের জয়টা খুব বড় একটা বিষয়। যে সৈনিক আগেই মনের মধ্যে হেরে যায় সে কোনোদিনও আর ময়াদানে জয়ী হতে পারে না। আর যে সৈনিক মনের দিক থেকে শক্ত থাকে, ময়দানে তাকে হারানো কঠিন।

মৃতের সংখ্যা : মুতার যুদ্ধে ১২ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। রোমকদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে তাদের সংখ্যা যে অনেক বেশি ছিল তা বিবরণ থেকে বুঝা যায়।

মুতার যুদ্ধের প্রভাব:

যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মুতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল সেই প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব না হলেও এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের সুনাম, সুখ্যাতি বহুদূর বিস্তার লাভ করে। সবচেয়ে বড় যে সাফল্য মুসলমানরা এ যুদ্ধে অর্জন করেছিলেন তা ছিল, একটি ক্ষুদ্র বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সামনে এক বা তিন দিন প্রতিরোধ করেছে এবং অবশেষে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছে। এতে সমগ্র আরব জগত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কেননা রোমকরা ছিল সে সময়ের শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

শক্তি। আরবরা মনে করতো যে, রোমকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া আত্মহত্যার শামিল। কাজেই মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এক লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা করার সাহস দেখানো কম গৌরবের বিষয় নয়। সারা বিশ্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, ইতোপূর্বে পরিচিত সকল শক্তির চেয়ে মুসলমানরা সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের সাথে রয়েছে। তাদের নেতা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের রাসূল। এ কারণেই দেখা যায় যে, মুতার যুদ্ধের পরে বেশ কিছু অহংকারী, জেদী গোত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

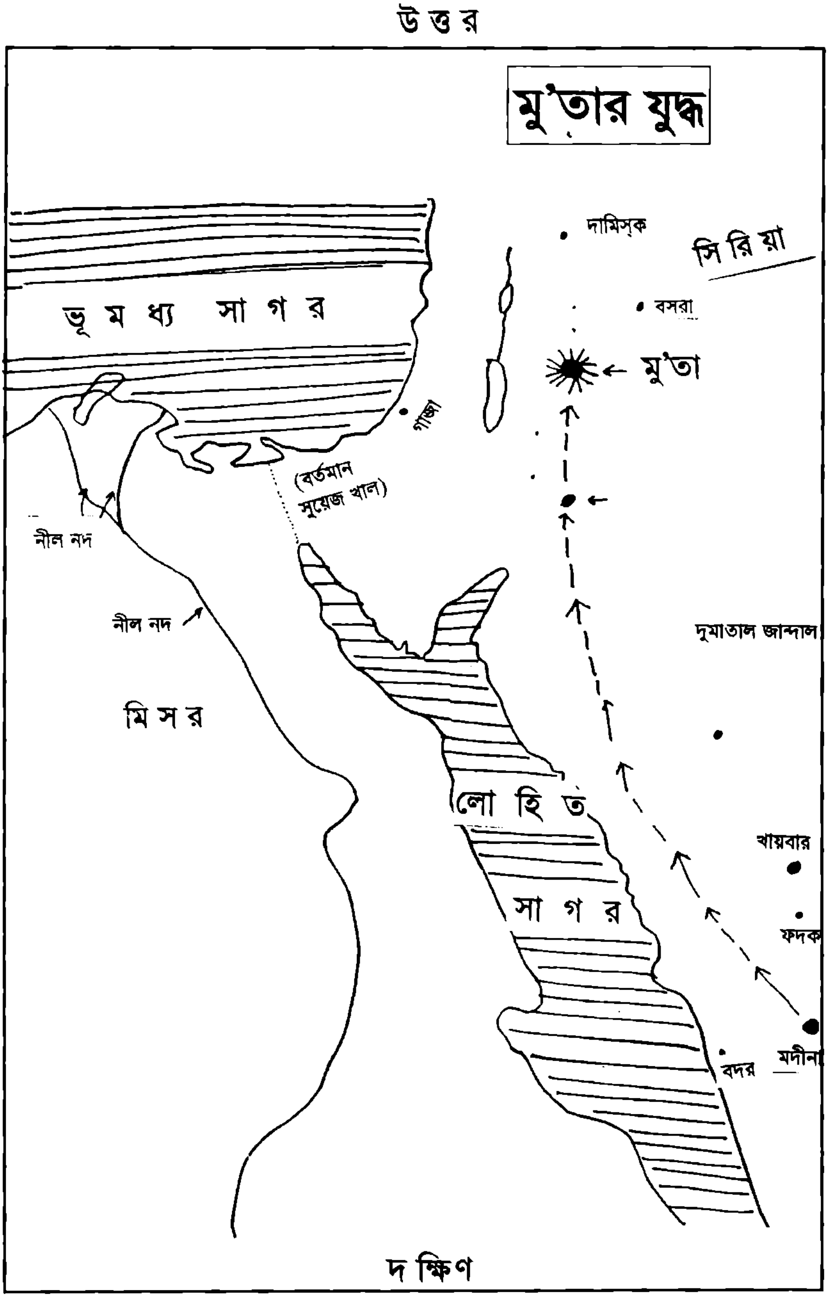

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়

ভূমিকাঃ

মক্কা বিজয় এমন একটি ঘটনা যেটাকে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম পাঁচটি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে অবশ্যই অন্যতম একটি হিসেবে ধরা যাবে। একাধিক কারণেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিজয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন, রাসুল এবং দ্বীনের আমানতদারদের মর্যাদা দান করেছেন। একইসাথে যে ঘরকে মহান আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের হেদায়েতের মাধ্যম করেছিলেন, সেই ঘরকে কাফের, মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.) যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমরবিদ ছিলেন, শ্রেষ্ঠ কমান্ডার ছিলেন, শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন, মক্কা বিজয়ের মাধ্যমেই সেটা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যে রাহমাতাল্লিল আলামিন ছিলেন, সেটিও মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়েছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র বা পটভূমিঃ

মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে সুসজ্জিত এক লক্ষ সৈন্যের বিপক্ষে লড়াইয়ের কারণে মু'তার যুদ্ধের পরে মুসলমানদের সুনাম, সুখ্যাতি এবং বীরত্বের যে প্রচার এবং বিস্ত তি ঘটেছিল, যে প্রভাব পড়েছিল, তাতেই সমগ্র বিশ্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, ইতোপূর্বে পরিচিত সকল শক্তির চেয়ে মুসলমানরা সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণেই দেখা যায় যে, মুতার যুদ্ধের পরে বেশ কিছু অহংকারী, জেদী গোত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর মক্কা বিজয়ের পথ সহজ হয়ে যায়। আরও যে বিষয়গুলো মক্কা বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করেছে সেগুলো হল, ধীরে ধীরে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্র বিস্তারের সাথে সাথে মহানবী (সা.) এর প্রভাব বাড়ছিল, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর খয়বরের উপত্যকাবাসীরাও আত্মসমর্পন করেছিল, মক্কাবাসীরা ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল। আরেকটি বড় কারণ হলো, আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে মনোকষ্টে ছিলেন। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি তাঁর হাবিবের দুঃখকে লাঘব করার ব্যবস্থা করবেন। মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বারবার অশ্রুসজল নয়নে নিজ মাতৃভূমির দিকে, নিজ শহরের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন, এসময় আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের

www.pathagar.com

আয়াত নাযিল করে বলেছিলেন যে, নিশ্চয়ই আপনি মক্কাতে পুনরায় ফিরে আসবেন। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের সুংসবাদ সেদিনই দেয়া হয়েছিল। মূলত এখানেই মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষিত রচিত হয়। তাই এ বিজয় দান করা বা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেটাকে বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত সময় হয়তো তখনই আল্লাহপাক মনে করেছিলেন।

মুসলিম সৈন্যের অবস্থানঃ

মক্কা শহরটা একটা উপত্যকায় অবস্থিত। এর চারিদেকে রয়েছে উঁচু উঁচু পাহাড়। মক্কায় প্রবেশের আগে মহানবী (সা.) তাঁর বাহিনীকে চারটি ভাগে ভাগ করে দিলেন, যেন তারা শহরের চারটি গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। রক্তপাত ও হাঙ্গামা পরিহার করার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন যে, বাধাপ্রাপ্ত না হলে কেউ যেন শক্তি প্রয়োগ না করে। সেই অনুযায়ী নিরাপদে প্রতিরোধহীন অবস্থাতেই চারটি গেট দিয়ে সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে। একমাত্র খালিদ বিন ওয়ালিদ কুরাইশ তীরন্দাজ বাহিনীর কাছ থেকে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হন। ইকরামা ও সুহাইল ইবনে আমরের প্ররোচনায় এক দল লোক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে অতি সহজে পরাজিত করা হয়। এতে শত্রুপক্ষের ১২/১৩ জন মতো নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। আর খালিদ বিন ওয়ালিদের পক্ষে শহীদ হন দু'জন।

মহানবী (সা.)কে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশটা অগ্রসর হলো উত্তর দিক থেকে প্রধান সড়ক ধরে। আবু উবায়দা আল জাররাহ (রা.) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে এলো। শহরের উঁচু অংশটা ছিল ওখানে। পূর্ব দিক থেকে মুসলিম বাহিনী এলো যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এর নেতৃত্বে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্র উপকূলে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া। পশ্চিম দিক থেকে সা'দ বিন উবাদা (রা.) এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদল এলো। তারা ইয়েমেন আর জেদ্দা পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিল। আর দক্ষিণ দিক থেকে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তার বাহিনী নিয়ে এলেন।

মুহাম্মদ (সা.) হিন্দ পর্বতের ঢালুতে অবস্থান করে শহরকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। সেখানে ছিলো মহানবী (সা.) এর স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) ও মহানবী (সা.) এর চাচা আবু তালিবের কবর। এই কবরের কাছে তাঁর জন্য একটা তাবু টাঙ্গানো হয়। এ দু'জনের সাথেই আল্লাহর রাসূলের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। বহু স্মৃতি বিজড়িত মক্কার কথা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো। তিনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন যিনি তাঁকে সফল করেছেন, বিজয়ী করেছেন।

বিভিন্ন সেনাদলের মধ্যে যা কিছু ঘটছিল সে সম্বন্ধে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে অবগত করানোর জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি যদি মনে করতেন যে, কোনো হস্তক্ষেপ বা হুকুম দেয়া জরুরী তবে তিনি সেটা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে পারতেন। মক্কা বিজয়ের শেষ পর্যায়ে একজন সেনা কর্মকর্তা তার সৈন্যদের বললেন যে, অহংকারী মক্কাবাসীর শিরচ্ছেদ করা হবে এবং শহরটি লুণ্ঠিত হবে। এ খবরটি তখনই মোহাম্মদ (সা.) এর কানে পৌছে যায়। তিনি সাথে সাথে ঐ সেনা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য একজনকে সে দায়িত্বটি দিলেন। অন্য একজন ছিলেন ঐ অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারই ছেলে। এখানেও রাসূল (সা.) প্রজ্ঞার পরিচয় দিলেন। কারণ বরখাস্তকৃত সেনা কর্মকর্তার যে মানসিক যন্ত্রণা হতে পারতো, তার ছেলে দায়িত্ব পাওয়ায় সেটা কমে গেল। আল্লাহর রাসূল বললেন যে, "না আজকে মক্কার ইজ্জত বেড়ে যাবে এবং এর পবিত্রতা কোনোক্রমেই নষ্ট করা হবে না কারণ এখানেই মুসলমানদের কিবলা অবস্থিত।" একটা সাধারণ ঘোষণা জারী করা হলো যে, শহরে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হবে।

মহানবীর রণকৌশলঃ

আল্লাহর রাসূল (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সেটি হল, যতটা সম্ভব রক্ষণাত্মক ভূমিকা অবলম্বন আর যতটা সম্ভব রক্তপাতহীন বিজয় অর্জনের চেষ্টা। রাসূল (সা.) এর সাধারণ নীতিই ছিল উভয় দিক থেকে শত্রুদের ধবংস করে দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে হতভম্ব করে দেয়া। এজন্য তিনি শত্রুদের উপর তখনই আক্রমণ করাকে সঠিক মনে করতেন যখন তারা একটু অপ্রস্তুত থাকতো। যে কারণে তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো না বা প্রতিহত করার সাহস থাকতো না। তারা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হতো। এর ফলে শত্রুদের সম্পদ, শক্তি, অস্ত্র সবকিছুই অব্যবহৃত থেকে যেত যেগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো। আরেকটি পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করতেন। সেটি হল কোরায়েশদের প্রতি অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা এবং দীর্ঘমেয়াদী নীতি হিসেবে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকা। এর ফলেও শত্রুরা বাধ্য হতো আত্মসমর্পন করতে।

মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের বিষয়টি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাহিনীর সংখ্যা, শক্তি এবং গন্তব্য সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা। এজন্য মোহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলকে নির্দেশ দিলেন মদীনায় সমবেত না হওয়ার জন্য। মক্কা বিজয়ের জন্য যে অভিযান সেটা মহানবী (সা.) একজন সমরবিদ হিসেবে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি বললেন মক্কায় যাওয়ার পথে তিনি যখন তাদের উপজাতীয় এলাকার পাশ দিয়ে যাবেন তখন যেন তাঁরা তাঁর সাথে যোগ দেন। এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, তিনি দশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু এটা হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে সমাবেশ। তিনি কখনই বললেন না যে আপনারা সকলেই মদীনায় আসুন। বরং মক্কা থেকে মদীনা যাবার পথে যতগুলো গোত্র বা সম্প্রদায় ছিল সেখান থেকে যেসব সৈন্য অবদান রাখতো,

www.pathagar.com

তাদেরকে বলা হল, তোমরা তোমাদের এলাকাতেই থাকবে, কখনই মদীনায় আসবে না এবং কেন তোমাদেরকে ডাকছি সেটা তোমাদেরকে বলিনি, যখন সাক্ষাৎ হবে তখন বলবো। আমরা মদীনা থেকে রওনা হয়ে যখন তোমাদের পাশ দিয়ে যাবো তখন তোমরা আমাদের সাথে যোগ দেবে। এই কৌশল এতই সফল হয়েছিল যে, মক্কা বেষ্টন করে রাখা পর্বতসমূহের অন্য পাশে মুসলমানরা তাঁবু ফেলার পূর্বে কোরাইশরা তাঁদের আগমন সম্বন্ধে কোনো খবরই পায়নি। এ অভিযানটি মহানবী (সা.) এত সংগোপনে, সন্তর্পনে ১২ দিন ১২ রাত যাত্রা করে সম্পন্ন করলেন যে মক্কাবাসীগণ কোনো অবস্থাতেই টের পেলেন না যে মুসলমানরা কোথায় আসলেন। অন্যদিকে কোরাইশদের হতবিহ্বল অবস্থাকে আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমান সৈন্যকে আলাদা আলাদাভাবে আগুন জ্বালানোর আদেশ দিয়েছিলেন মহানবী (সা.)। যে কারণে রাতের দশ হাজার অগ্নিকু দেখে কুরাইশদের মনে এই ধারণা জন্ম নিল যে, অনেক অনেক লোকের খাবার-দাবার প্রস্তুত হচ্ছে। আল্লাহতায়ালও সাহায্য করলেন। মক্কাবাসীদের সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ানও ঐ রাত্রে ধরা পড়ল মুসলমান গুপ্তচরদের হাতে। ফলে মক্কাবাসী কেউ বুঝতে পারছিল না যে তাদের করণীয় কি? আবু সুফিয়ান যেন মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তি, সংখ্যা এবং ক্ষমতা দেখতে পারে সেরকম জায়গায় তাকে রাখা হল। পরবর্তীতে আবু সুফিয়ানকে ছেড়ে দেয়া হয় এই বলে যে, তিনি যেন মক্কাবাসীকে এই নিশ্চয়তা দেন যে, যারা তাদের নিজেদের ঘরে থাকবে তারা নিরাপদ থাকবে, যারা কাবাগৃহের চারদিকে আশ্রয় নিবে তারা নিরাপদ থাকবে অথবা যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরও কোনো ক্ষতি হবে না। আবু সুফিয়ানকে এভাবে ছেড়ে দেয়া ছিল রাসূলের তরফ থেকে একটা পুরস্কার। কারণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাস্তার ছেলেরা এবং মক্কার সাধারণ লোকেরা যখন মহানবীকে (সা.) কষ্ট দিত তখন তিনি আশ্রয় নিতেন আবু সুফিয়ানের বাড়িতে। তাই তার এই বদান্যতার কথা রাসূল (সা.) ভুলে যাননি। যদিও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল। আরও একটি বড় কারণ ছিল যেটা সেটা হল, সেই মুহূর্তে মক্কায় অভিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি কমে গিয়েছিল। আবু জেহেল মারা গিয়েছে, খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর আবু সুফিয়ানকে আটকে রেখে এবং তাকে এইরকম একটা শর্ত দিয়ে ভয়ের মধ্যে থাকা মক্কাবাসীর সামনে আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে এই বার্তা পৌঁছে দিয়ে প্রকারান্তরে শান্তি পূর্ণ ও রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের পথই সুগম করা হয়েছিল। কারণ ঐ সময় মুসলমান বাহিনীকে বাধা দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও আবু সুফিয়ানের পক্ষে তখন আর সেটা করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু মুসলমানরা ইতোমধ্যেই মক্কা পৌঁছে শহরে ঢোকার সব রাস্তা দখল করে নিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান বুঝেছিল যে, এখন বাধা দেয়াটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। মুসলমানদের শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য।

www.pathagar.com

মক্কার পথে আবু সুফিয়ানঃ

আল্লাহর রাসূল (সা.) আবু সুফিয়ানকে ছেড়ে দেয়ার মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পেলেন। আবু সুফিয়ানকে আটকে রাখায় সে ইসলামের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা পেল। আল্লাহর রাসূল ভাবলেন আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে গিয়ে সেখানকার জনগণকে ইসলামের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভয় দেখাবে এবং তাদের মাথা থেকে প্রতিরোধের সকল চিন্তা দূর করে দেবে। সেখানকার অধিবাসীদেরকে মুসলমানদের অস্বাভাবিক শক্তি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং সম্ভাব্য মুক্তির পথও দেখাবে। বাস্তবে হলোও তাই। আবু সুফিয়ান মক্কা নগরীতে ফিরে গেল। একদিন আগে থেকেই সেখানকার জনগণের মধ্যে ভীতি কাজ করছিল। তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। তারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানের পাশে জড়ো হলো। আবু সুফিয়ান তাদের উদ্দেশ্যে বলল, ইসলামী সেনাবাহিনী তাদের ইউনিট নিয়ে পুরো শহর ঘিরে ফেলেছে। আর কিছু সময়ের মধ্যেই তারা শহরে প্রবেশ করবে। তাদেরকে প্রতিহত করার শক্তি আমাদের নেই। তবে তাদের অধিনায়ক ও নেতা মুহাম্মদ আমাকে কথা দিয়েছেন, যে কেউ মসজিদ ও কাবার প্রাঙ্গনে আশ্রয় নেবে বা মাটিতে অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিরপেক্ষভাবে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে অথবা আমার ঘরে প্রবেশ করবে, তার জান মাল সম্মানিত বলে গণ্য হবে এবং সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। সে নিরাপদ থাকবে। আবু সুফিয়ানের এ ঘোষণার মাধ্যমে মক্কার অধিবাসীদের মনোবল যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল সেটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গেল। জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারলো সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল। এভাবে মহানবী (সা.) এর প্রাজ্ঞ পরিকল্পনার কারণেই রক্তপাতহীন এই মক্কা বিজয় সম্ভব হয়।

মক্কা বিজয়ঃ

মক্কা বিজয়ের তারিখটি ছিল ৮ম হিজরীর ২১ রমজান বা ৬২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর। উপযুক্ত সময়ে মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রবেশের সময় ঘোষণাকারীদের দিয়ে ঘোষণা করা হল যে, আজ মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করছে। মুসলমানগণ সশস্ত্র, তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রয়োজন না হলে তারা যুদ্ধ করবে না। তারা মক্কাবাসীদেরকে আহবান জানাচ্ছে যেন তারা যুদ্ধ না করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মক্কাবাসীগণ ঠিক সেই মুহূর্তে যুদ্ধ করার মত অবস্থাতে ছিল না। মুসলমানরা মক্কার চতুর্দিক থেকে ঘিরে চারটি রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করলো। যে কারণে সকল মক্কাবাসী আত্মসমর্পনে বাধ্য হল। লক্ষণীয় বিষয় হল, রাসুলুল্লাহ (সা.) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয় করার জন্য আসলেও তার দশ ভাগের এক ভাগকেও যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়নি। তাহলে আমরা কি একবার ইতিহাসে ফেরত যাব না? আমরা কি একবার বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের প্রচারণার দিকে তাকাব না? যেই সকল ব্যক্তি

www.pathagar.com

ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, জেনে অথবা না জেনে প্রচার করেন যে, ইসলাম প্রচারিত, প্রসারিত হয়েছে তরবারীর দ্বারা। এই মক্কা বিজয় একটি উদাহরণ যেখানে তরবারী কতটা ব্যবহার হয়েছে? রাসুল (সা.) মক্কাবাসীকে যুদ্ধ করার কোনো সুযোগই দেননি। অর্থাৎ কৌশলটাই এমন ছিল যে, সেখানে যুদ্ধ করার প্রস্তুতির সুযোগ দেয়া হয়নি। আরেকটি কারণ হল, তারা যুদ্ধ করবেনই বা কিসের বিরুদ্ধে? কারণ রাসুল (সা.) যে উদারতা দেখালেন সেটার বিরুদ্ধে তো আর যুদ্ধ করা যায় না।

মক্কা বিজয় ছিল সেই মহান বিজয়, যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর দ্বীনকে, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর দ্বীনের আমানতদারদের মর্যাদা দিয়েছেন। এছাড়া হেদায়েতের মাধ্যম হিসেবে গড়ে ওঠা কাবা ঘরকে কাফের মোশরেকদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। এই বিজয়ের ফলে আল্লাহ্ পাকের দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং বিশ্বজগতের চেহারা পাল্টে যায়।

মক্কা বিজয় ইতিহাসে আকর্ষণীয় অধ্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। একইসাথে এটি শিক্ষণীয় এবং তা মহানবী (সা.) এর পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ এবং তাঁর মহান চরিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিহাসের এ অধ্যায়টি অধ্যায়ন বা মূল্যায়ন করলে শত্রুর সর্বশেষ ও সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি জয় করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এর দক্ষতা, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল প্রমাণিত হয়ে যায়। যার মাধ্যমে মুসলমানরা অনায়াসে রক্তপাতহীনভাবে সর্ববৃহৎ বিজয় অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি যখন তাঁর নিজ জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন প্রবেশ করলেন বিজয়ীর বেশে। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল দীর্ঘ আট বছরের অবিরত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্যের পর। তাঁরই পরিচিত আত্মীয়বর্গ এবং মক্কাবাসীরা চালিয়েছিল এই নির্যাতন। কিন্তু তিনি কোনো অহমিকাপূর্ণ অত্যাচারী শাসকের মতো মক্কায় প্রবেশ করেননি। বরং অস্বাভাবিক ভদ্রভাবে এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে প্রবেশ করেছিলেন। যে উটের পিঠে তিনি বসেছিলেন তার ওপরেই ভক্তিভরে আল্লাহতায়ালাকে সিজদা করছিলেন আর শুকরিয়া আদায় করছিলেন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তিনি যুদ্ধের পোশাক এবং শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। সে সময় আনসার মুহাজিরগণ খুব মর্যাদার সাথে তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। তাঁর চলার পথের দু'ধারে মুসলিম এবং মুশরিকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। একদলের মনে ক্রোধ, হতাশা আর ভয় কাজ করছিল। অন্য একদল আনন্দ প্রকাশ করছিল।

ক্ষমার উদাহরণ:

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) শত্রুদের সাথে যে আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীর কোনো বিজয়ী শক্তি পরাজিত শত্রুদের সাথে এমন বিনয় ও মহানুভবতা প্রদর্শন করতে পারেনি। কারণ দীর্ঘ তের বছর ধরে

www.pathagar.com

তারা মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর গর্বিত, অহংকারী কুরাইশরা কষ্ট দিয়েছিলো, দুর্ব্যবহার করেছিলো, অত্যাচার করেছিলো, এমনকি হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। তাদের কাছে তিনি ফিরে এলেন বিজয়ী বাহিনীর প্রধান হিসেবে। ওরা সেই গোষ্ঠী যারা বহুবার মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত যুদ্ধ বাধিয়ে মহানবী (সা.) এর তরুণ অনুসারী ও সাহাবীদেরকে হত্যা করেছিলো। তাই মক্কাবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা নিশ্চিত ছিলো যে, মুসলমানরা তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তারা অপেক্ষা করছিল যে, মুসলমান বাহিনী মক্কায় প্রবেশের সময় কোনো প্রতিশোধ নেয়নি, কিন্তু এখন বোধহয় একটি বিচার বসবে। এখন বোধহয় কিছু লোকের মৃতুদ হবে, এখন বোধহয় কিছু লোক বিতাড়িত হবার আদেশ পাবে। এ সময় মহানবী (সা.) কাবা শরীফের কাছে আসলেন, কাবা শরীফ তাওয়াফ করলেন। এরপর সকলকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে মক্কাবাসীগণ তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কি ব্যবহার আশা কর? মক্কাবাসীরা উত্তর দিতে পারছিল না। তাদের শরীর কাঁপছিল, তাদের মন কাঁপছিল। তারা অস্থির এবং মহানবীর সুমহান দয়া, মমত্ববোধ ও আবেগ অনুভূতির কথা মনে করে বলেছিল, আপনি আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন এটাই আমাদের ধারণা। এ সময় আল্লাহর রাসুল তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস মত ঘোষণা দিলেন আজ থেকে তোমরা মুক্ত। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। সুরা ইউসুফ এর ৯২ নম্বর আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে *"ক্বালু তাল্লাহি লাকাদ আছারাকাল্লাহু আলাইনা ওয়া ইন কুন্না লাখাত্বিঈন"* অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন, তিনি মহান, দয়ালু।

এই যে ঘোষণাটি তিনি দিলেন এটি কিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? এটি ঐ বাক্যের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ যেটি পবিত্র কোরআনে রাসুলে পাক (সা.)কে উদ্দেশ্য করে বলা আছে। *'ওয়ামা আর সালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন'* অর্থাৎ আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। সেই রাহমাতাল্লিল আলামিন কোনোদিনও নিজ মাতৃভূমি মক্কানগরীর অধিবাসীদের উপর কোনো শাস্তির হুকুম দিতে পারতেন না, তিনি দেননি। তবে এই উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে লেখাপড়া করতে গিয়ে দেখেছি, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইসলামের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস, ভারতীয় মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, বৃটিশ শাসনের ইতিহাস কোথাও পাইনি।

কা'বা ঘরে প্রবেশ এবং মূর্তি অপসারণঃ

মক্কার লোকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর মহানবী (সা.) আনসার মোহাজেরদের সাথে নিয়ে মসজিদে হারাম-বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করলেন।

www.pathagar.com

প্রথমে তিনি শ্রদ্ধার সাথে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর চুম্বন করলেন এরপর কাবাঘর তওয়াফ করলেন। সে সময় আল্লাহর রাসূলের হাতে ছিল একটি ছড়ি। কা'বা ঘরের আশেপাশে এবং ছাদের ওপর সে সময় তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। আল্লাহর রাসূল তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে সেই সব মূর্তিকে গুঁতো দিচ্ছিলেন আর পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাঈল এর ৮১ নম্বর এই আয়াতটি উচ্চারণ করছিলেন *'ওয়া কুল জায়াল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা'* অর্থাৎ 'সত্য এসেছে এবং অসত্যের চলাফেরা শেষ হয়ে গেছে।' কা'বা ঘরের ভেতরে অনেকগুলো ছবি ছিল। এ সব ছবির মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) এর ছবিও ছিল। তাঁদের হাতে ভাগ্য গণনার তীর ছিল। এ দৃশ্য দেখে এগুলোকেও আল্লাহর রাসূল ধ্বংস করতে বললেন। কা'বা ঘরের মধ্যে কাঠের তৈরি কবুতর ছিল। সেটি তিনি নিজ হাতে ভেঙে ফেললেন। এভাবে বিশ বছর আগে মূর্তি অপসারণের যে মিশন শুরু করেছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা.), সেটা মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেই আল্লাহর ঘর থেকে সেই পৌত্তলিকতার শিকড় উপড়ে ফেললেন।

কা'বা ঘরে নামাজ আদায় এবং কোরায়েশদের উদ্দেশ্যে ভাষণঃ

কা'বা ঘরের ভেতরে আল্লাহর রাসূল (সা.) নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি কাবা ঘরের ভেতরের অংশ ঘুরলেন। সকল অংশে তকবীর এবং তওহীদের বাণী উচ্চারণ করলেন। কোরায়েশরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা অপেক্ষা করছিল যে আল্লাহর রাসূল কি করেন। আল্লাহর রাসূল দু'হাতে দরজার দুই পাল্লা ধরে কোরায়েশদের উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে তিনি একাই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করেছেন। হে কোরায়েশরা, আল্লাহপাক তোমাদের মধ্য থেকে জাহেলিয়াত এবং পিতা ও পিতামহের অহংকার নিঃশেষ করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম সন্তান আর আদম মাটি থেকে তৈরি। এরপর তিনি কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মোত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন সমস্ত খবর রাখেন।'

www.pathagar.com

আল্লাহর সাহায্যঃ

মক্কা বিজয় যে আল্লাহ্ তায়ালার আরেকটি অন্যতম সাহায্য ছিল তার প্রমাণ হলো সূরা কাসাসের ৮৫ নম্বর আয়াত। মক্কা থেকে রাসূল (সা.) বিতাড়িত হবার পর মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনের এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি মহানবীকে তাঁর আপন মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছিলেন, *"ইন্নাল্লাজি ফারাদা আলাইকাল কুরআনা লারা—দ্দুকা ইলা মাআদ; কুর রাব্বি আ'লামু মান জ্বা-আবিল হুদা ওয়া মান হুয়া ফি দালালিম মুবিন।"* অর্থাৎ যিনি তোমার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন; বল আমার রব ভালো জানেন কে সত্য ধর্মে সমাসীন এবং কে স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে পতিত। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, 'মহান আল্লাহ তায়ালা নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন'–অর্থাৎ এ কথা বলার মাধ্যমে মহানবী (সা.) সবাইকে অবগত করলেন যে, গায়েবী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

উপসংহারঃ

যে কথাটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বারবারই উল্লেখ করতে হবে যে, মিথ্যা প্রচারণা প্রকৃত সত্যকে ঢেকে দিতে পারবে না, ইসলাম তরবারীর জোরে আসেনি, মক্কা বিজয় তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রয়োজনেই আল্লাহর রাসুল যুদ্ধ করেছেন কিন্তু এমন কৌশল আর রক্ষণাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করে যেখানে শত্রুদেরকে ধবংস করে দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে হতভম্ব করে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তারা অপ্রস্তুত থাকতো, তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো না, তারা আত্মসমর্পন করতো, এজন্য রক্তারক্তি হতো না। অথবা কম হতো, হতাহত কম হতো। জোর করে কাউকে মুসলমান বানানো হয়নি। শত্রুরা আত্মসমর্পন করার পর মুসলমানদের সাথে মেলামেশার কারণে তারা মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো। এর অনেক অনেক অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। একটি ঘটনা উল্লেখ করি মক্কা বিজয়ের দিনের। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা.) এর বক্তৃতা শুরুর ঠিক আগে কাবাঘরের মিনারে উঠে হযরত বেলাল (রা.) উচ্চস্বরে আজান দিতে আরম্ভ করলেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ মহান! আল্লাহ মহান! ওখানে সমবেত জনগণের মধ্যে আত্তাব ইবনে আসিদ নামে একজন মূর্তিপূজক ছিল। এই আজান শুনে সে তার এক বন্ধুকে কানে কানে বলছিল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কাবা ঘরের ছাদের ওপরে উঠে নিগ্রোটা যেভাবে চিৎকার করছে সেটা শোনার জন্য আমার বাবা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে সে এটা সহ্য করতে পারতো না। মাত্র কয়েক মিনিট পরের ঘটনা হলো এই যে, মহানবী (সা.) মক্কাবাসীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। যেখানে মক্কার লোকেরা নিজের নিজের উপরে সম্ভাব্য শাস্তির ভয়ে ভীত ছিল। তখন

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সা.) ক্ষমার ঘোষণা দিলেন। এতে ঐ ব্যক্তি এতই অভিভূত হলো যে, সে মহানবী (সা.) এর কাছে গিয়ে বলল, "আমি আসিদের পুত্র। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর নবী। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এমনই রণকৌশলী ছিলেন আল্লাহর রাসূল। আর কোন বিষয়েই বা আল্লাহর রাসূল শ্রেষ্ঠ ছিলেন না? প্রিয় পাঠক, আপনারাও এ বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভাবুন, একটু গবেষণা করুন। আমরা প্লেটো সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি, ডারউইনের পড়ি, ম্যালথাস পড়ি কিন্তু ধর্মীয় বই পড়তে আমরা আগ্রহী নই। অথচ এ বিষয়গুলো জানতে চেষ্টা করলে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই, উপকৃত হবার সম্ভাবনা পুরোটাই। আল্লাহর রাসূল (স.) সব বিষয়েই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি পরিবারের প্রধান ছিলেন, তিনি ধর্ম প্রচারক ছিলেন, তিনি সমাজসেবক ও সমাজ সংগঠক ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, তিনি সেনাপতি ছিলেন। সমকালীন সাহিত্য বা ইতিহাসে মানব সভ্যতার ওপর সবচাইতে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামটিকেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের আইন প্রণেতা বা আইনদাতা হিসেবে মহানবী (সাঃ) এর নামও তাই সবাই এক নম্বরেই স্মরণ করে।

www.pathagar.com

উত্তর

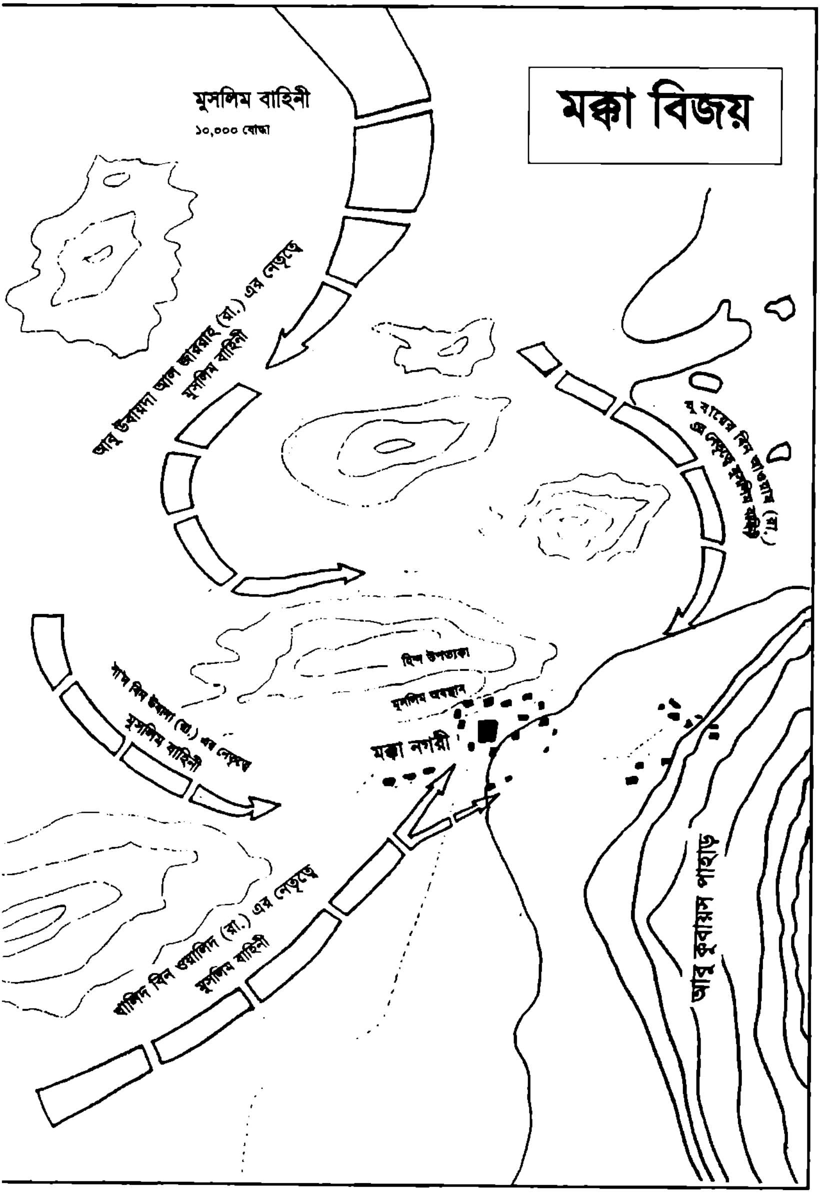

দক্ষিণ

www.pathagar.com

হুনায়নের এবং তায়েফের যুদ্ধ

হুনায়নের যুদ্ধের পটভূমি বা কারণঃ

মক্কা বিজয়ের পরেই হয়েছিল হুনায়নের যুদ্ধ। আর তায়েফের যুদ্ধ ছিল হুনায়নের যুদ্ধেরই একটি অংশ।

হঠাৎ অভিযানের মাধ্যমে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। এতে আরবের জনগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত অভিযানের মোকাবিলা করার শক্তি প্রতিবেশী গোত্রসমূহের ছিল না। এ কারণে শক্তিশালী, অহংকারী এবং উচ্ছৃঙ্খল কিছু গোত্র ছাড়া অন্য সবাই আত্মসমর্পণ করেছিল। উচ্ছৃঙ্খল গোত্রগুলোর মধ্যে হাওয়াযিন এবং ছাকিফ ছিল নেতৃস্থানীয়। তাদের সাথে মুযার জোশাম সাদ ইবনে বকর-এর গোত্রসমূহ এবং বনু বেলালের কিছু লোক শামিল হয়েছিল। এরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করাকে তাদের আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করছিল। তাই তারা মালেক ইবনে আওফ নসরীর কাছে গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। বিষয়টি অবগত হয়ে মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ঐ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছদ্মবেশে কয়েকদিন সেখানে থেকে আসন্ন আক্রমণের ব্যাপারে তাদের প্রস্তুতির খবর নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বললেন। এই খবর শোনার পর মহানবী (সা.) দুশমনদেরকে তাদের নিজেদের মাটিতে মোকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে রওনা দিলেন।

হুনায়নের অবস্থানঃ

হুনায়নের অবস্থান নিয়ে একটু মতপার্থক্য আছে। কারো মতে এটা ছিল মক্কা থেকে ১ দিনের দূরত্বের পথ অর্থাৎ প্রায় ১৫ মাইল দূরে, আবার কারো মতে এটা ছিল মক্কা থেকে ৪ দিনের রাস্তা। ঐতিহাসিকরাও মক্কা থেকে হুনায়নের দূরত্ব নিয়ে নানারকম মতামত দিয়েছেন। তবে সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে যেটা অনুমান করা যায় সেটা হল, হুনায়নের যুদ্ধটা সংঘটিত হয়েছিল মক্কা এবং তায়েফের মাঝামাঝি একটা জায়গাতে। আর মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্ব ছিল উটের পিঠে দুই থেকে তিন দিনের রাস্তা।

হুনায়নের যুদ্ধটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং

www.pathagar.com

শিক্ষণীয় যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে পরাজিত হয়েছিল। পরে আবার রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নেতৃত্বে তারা নিজেদেরকে সামলে নিয়ে বিজয় অর্জন করেছিল। এই যুদ্ধের গুরুত্ব যে কত বেশি ছিল এবং এই যুদ্ধ যে স্পষ্ট একটা বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে সে ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। কেন মুসলমানরা পরাজিত হচ্ছিল এবং পবিত্র কোরআনে কি আয়াত নাযিল হয়েছিল, একটু নিচের অধ্যায়ে গিয়ে সে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

শত্রুদের রওনা এবং সৈন্য সমাবেশ:

শত্রুদের সিদ্ধান্তের পর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে মালেক ইবনে আওফের নেতৃত্বে সকল অমুসলিম রওনা হলো। তারা তাদের পরিবার-পরিজন এবং তাদের গবাদি পশুপাল নিজেদের সাথে নিয়ে রওনা দিল। তারা আওতাস প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলো। আওতাস হচ্ছে হোনায়েনের কাছে বনু হাওয়াযিন এলাকার একটি প্রান্তর। আওতাস-এ অবতরণের পর লোকেরা কমান্ডার মালেক ইবনে আওফের সামনে হাজির হলো। মালেক ইবনে আওফ মুসলমানদের সাথে মরণপণ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সৈন্যদের সাথে তাদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র অর্থাৎ পরিবার-পরিজনসহ পশুপালও সাথে নিয়ে এলো। উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন কোনোভাবেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছপা না হয় বা পালিয়ে না যায়। অর্থাৎ হয় তারা আমৃত্যু যুদ্ধ করবে অথবা বিজয় লাভ করবে।

এদের সাথে দুরাইদ নামে একজন প্রবীণ সমর বিশারদ ছিল। বয়সের ভারে সে তখন ন্যূব্জ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অতীতের অনেক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল তার। সে যখন পরিবার-পরিজন এবং পশুপাল সাথে নিয়ে আসার বিষয়টি অবগত হল তখন সে এটার প্রতিবাদ করলো। সে তার কমান্ডারকে বলল, এটি ভুল ধারণা। পরাজিত ব্যক্তিকে কোনো কিছুই আটকিয়ে রাখতে পারে না। অধিকন্তু ধন-সম্পত্তি বা স্ত্রী-পুত্র তখন আরও বিপদ বাড়িয়ে তুলবে। আর জয়ী হলেতো এসবের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। কারণ তারা তখন এমনিতেই তোমার সাথে এসে মিলিত হবে। সুতরাং তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দাও।

কমান্ডার মালেক ইবনে আওফ এ পরামর্শটি প্রত্যাখ্যান করলো। দুরাইদ বলল, দেখো, যুদ্ধে যদি তুমি জয়ী হও, তবে তলোয়ার আর বর্শা দ্বারাই উপকৃত হবে। আর যদি পরাজিত হও তাহলে অনেক বেশি অপমানিত হবে।

মক্কা থেকে হুনায়নের পথে যাত্রা:

অষ্টম হিজরীর ৬ শাওয়াল মাসের দিনের বেলায় মদীনা থেকে আগমনকারী দশ হাজার এবং মক্কায় নতুন মুসলমান হওয়া দুই হাজার সৈন্যসহ মোট বার হাজার সৈন্য

www.pathagar.com

নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হুনায়নের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মক্কার দুই হাজারের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নও মুসলিম। এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মক্কায় আগমনের উনিশতম দিন। তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া সব যুদ্ধেই শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহানবী (সা.) স্পষ্টতই সেনাবাহিনী নিয়ে উল্টোদিকে রওনা দিয়েছিলেন। তিনি ঘুরপথ অনুসরণ করতেন এবং যথেষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে মূল জায়গায় এগিয়ে আসতেন। তবে হুনায়নের এই যাত্রার কথা এভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলিম বাহিনীর এ যাত্রা ছিল বেশ শান-শওকতের সাথে। বিচিত্র পতাকা উড়িয়ে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে তারা হুনায়নের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাজার। লক্ষণীয় বিষয় হলো, অতীতে সব যুদ্ধেই মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল কম, শত্রুদের সংখ্যা ছিল বেশি। তাতেই মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল। আর এবার মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা বেশি। সুতরাং চার-পাঁচ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে বার হাজার সৈন্যের এই অভিযান, সফলতো হবেই; অনেকের মনের মধ্যেই হয়তো এ বিষয়টি কাজ করছিল। একজন সাহাবীর মুখ দিয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল যে, "আজ আর আমাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না।" কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অহংকার পছন্দ করেন না। কারণ জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে কোনো মানুষই কিছু করতে পারে না। ধনবল, জনবল কোনো কিছুই কাজে আসে না। এটাই হুনায়নের যুদ্ধে খুব ভালো করে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়ে দিলেন। শত্রুরা গিরিপথের দুইধার আত্মগোপন করে লুকিয়ে ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। মুসলমানরা ঐ এলাকা সম্পর্কে অবগত ছিল কম। ফলে তারা সেখানে যাওয়া মাত্র শত্রুরা বৃষ্টির মত তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। মুসলমানরা ছিল কিছুটা ভাবনাহীন মনে। ফলে অতর্কিত এই আক্রমনে তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। পিছু হেঁটতে লাগলো। শত্রুদের প্রাথমিক হামলাতেই মুসলমানরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো, বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো, দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লো, তারা পরাজিত হলো। যদিও পরে তারা ঘুরে দাঁড়ালো, কিন্তু সাময়িকভাবে তাদের পরাজয় হলো। তাদের অহংকার মাটিতে মিশে গেল। কারণ তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেনি এখানে এ ধরণের অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা তওবার ২৫-২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *"লাক্বাদ নাসারাকুমুল্লাহু ফী মাওয়াত্বিনা কাসিরাতিওঁ ওয়া ইয়াওমা হুনাইন। ইয আ'জ্বাবাতকুম কাছরাতুকুম ফালাম তুগ্বনি আনকুম শাইয়াওঁ ওয়া দ্বাকাত আলাইকুমূল আরদু বিমা রাহুবাত ছুম্মা ওয়াল্লাইতুম মুদবেরিন।। ছুম্মা আনযালাল্লাহু ছাকিনাতাহু আলা রাসূলিহি ওয়া আলাল মুমিনিনা ওয়া আনসালা জুনুদাল লাম তারাওহা ওয়া আজ্জাবাল্লাজিনা কাফারু; ওয়া জা-লিকা জাযা—উল কাফিরিন"*। অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ, তোমরা হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। যখন তোমরা নিজেদের সৈন্য

www.pathagar.com

সংখ্যা বেশি দেখে গর্বিত হয়েছিলে। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে তোমাদের কোনো কাজ হল না। আর এই বিশাল ভূম ল তোমাদের কাছে সংকীর্ণ মনে হতে লাগলো। এরপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়নরত হলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন রসূল এবং মুসলমানদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন যাঁদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর কাফিরদেরকে আযাবে নিপতিত করলেন। এটাই কাফিরদের শাস্তি।

হুনায়নের যুদ্ধের এই অবস্থায় আমরা ওহুদের যুদ্ধের কথা মনে করতে পারি। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে জয়ী হয়ে পরমুহূর্তে পরাজিত হয়েছিলেন। আর হুনায়নে প্রথমে পরাজিত হয়ে পরমূহূর্তে জয়ী হয়েছিলেন। বস্তুত দুটো যুদ্ধই ছিল তাঁদের দারুণ শিক্ষাক্ষেত্র। ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলে কিভাবে নিজেকে সামলিয়ে নিতে হয়, সেই শিক্ষাই তারা লাভ করেছিলেন এই উভয় যুদ্ধে। নেতার আদেশ লঙ্ঘন করার পরিণাম যে কত শোচনীয়, সে শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছিলেন ওহুদে আর অহংকারের কুফল যে কত মারাত্মক, সে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছিলেন হুনায়নে। উভয় যুদ্ধে তাঁদের ঈমানের কঠোর পরীক্ষাও হয়েছিল। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়া কিংবা অন্য কোনো স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ থাকলেও তাদেরকে দলভুক্ত করার পরিণাম যে ভীষণ শোচনীয় হয়, এ শিক্ষাও মুসলমানরা লাভ করেছিলেন এই হুনায়ন যুদ্ধে।

প্রাথমিক পরাজয়ের কারণ:

সূরা তওবার ২৫ নম্বর আয়াতের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। আয়াতে বলা হল, "হে মুসলমানগণ, তোমরা হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। যখন তোমরা নিজেদের সৈন্য সংখ্যা বেশি দেখে গর্বিত হয়েছিলে। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে তোমাদের কোনো কাজ হল না। আর এই বিশাল ভূম ল তোমাদের কাছে সংকীর্ণ মনে হতে লাগলো। এরপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়নরত হলে"। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করাই যে এ পরাজয়ের অন্যতম কারণ তা আমরা বুঝতে পারলাম। এছাড়া সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার আদেশেই সংঘটিত হয়, আর কোনো কিছু সংঘটিত হলে তার বাহ্যিক কারণও আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে দেন। এই যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় এ ধরণের পরাজয়ের পেছনে এরকম দু'একটি কারণও আমরা দেখতে পাই। যেমন মুসলমানদের বারো হাজার সৈন্যের মধ্যে দুই হাজার ছিল মক্কা থেকে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা মুসলমান। তাদের অন্তরে তখনও ইসলামী শিক্ষার প্রতিক্রিয়া এবং ইসলামের প্রতি মমতা ততটা গাঢ় হয়নি। ধর্মের চেয়ে জীবনের মমতা ছিল তাদের বেশি। তাদের মধ্যে অনেকেই গণীমতের মালের লোভেই এ যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। বর্ণনা আছে যে, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সবাই পালিয়ে যায়নি বরং নওমুসলিম

www.pathagar.com

এবং কিছু পৌত্তলিক যারা এই যুদ্ধে যোগদান করেছিল তারাই প্রথমে পালিয়ে যেতে শুরু করে। এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং বিপর্যয় ঘটে।

মহানবী (সা.) এর দৃঢ়তা এবং আল্লাহর সাহায্যঃ

মহানবী (সা.) ছিলেন সৃষ্টির সেরা মহামানব। সারা জাহানকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ছিলেন সমগ্র জগতের আদর্শ। সবাই যেন তাঁকে অনুসরণ করতে পারে সেই দৃষ্টান্তই তিনি রেখে গিয়েছেন। এজন্যই তিনি হেরা গুহায় আত্মগোপন করেছেন, মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করেছেন, শত্রুর সাথে সন্ধি করেছেন, যেন মানুষ শিখতে পারে। তা নাহলে লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও তাঁর জন্য কোনো সাহায্যকারী প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহপাক। হুনায়নের যুদ্ধে একটি দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করলেন। বারো হাজার সৈন্য যখন পিছু হেঁটে আসলো তখন শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল অবিচল চিত্তে যুদ্ধে রত থাকলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সেনাপতির উদাহরণ দেয়া সম্ভব নয়। সহীহ্ মুসলিম এবং বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্লাহর রাসূল সেদিন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলছিলেন "আমি নবী, এটা মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।"

বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, শুধু একা রাসূলুল্লাহ (সা.) রণক্ষেত্রে থাকলেন আর মুসলমানরা সকলেই যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে পালালো।

মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আব্বাস বলেন, 'আমি ও আবু সুফিয়ান এক মুহূর্তের জন্যও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গ ত্যাগ করিনি।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে সেদিন যারা রাসূলের (সা.) পাশে ছিলেন তারা হলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্বাস ও তাঁর পুত্র ফজল, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ও তাঁর পুত্র জা'ফর, হযরত রবী'আ ইবনে হারিস, হযরত আয়মন ইবনে উম্মে আয়মন, হযরত উসামান ইবনে যায়দ রিযওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম।

অর্থাৎ আলোচনা থেকেই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বারো হাজার সৈন্যের মধ্যে কয়েকজন তাঁর পাশে থাকাটা ঐ একা থাকারই শামিল।

বিপর্যয় একটু কাটিয়ে পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূল বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাকলেন। সেই সব গোত্রগুলো অর্থাৎ মুসলমানরা খুব দ্রুত রাসূলের কাছে ছুটে এলেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে দিতে লাগলেন। এখানে সূরা তওবার ২৬ নম্বর আয়াতটিও লক্ষ্যণীয়। এ যুদ্ধে যে আল্লহতায়ালা সাহায্য করলেন তার প্রমাণ হলো এই আয়াতটি। যেখানে আল্লাহতায়ালা বললেন,

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আপন রসূল এবং মুসলমানদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন যাঁদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর কাফিরদেরকে আযাবে নিপতিত করলেন। এটাই কাফিরদের শাস্তি।

শত্রুদের সেই উদ্দেশ্য সফল হলো না। বরং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম বাহিনীর সামনে শত্রুদের মহিলা, শিশু, গবাদিপশুগুলো পরিণত হলো মুসলমানদের গনীমতের মালে।

তায়েফের যুদ্ধঃ

তায়েফ অবরোধটা হুনায়ন যুদ্ধেরই একটা অংশ ছিল। হাওয়াযিন এবং সাকিফ গোত্রের পরাজিত লোকদের অধিকাংশই তাদের কমান্ডার মালেক ইবনে আওফ এর সাথে তায়েফ চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফের পথে রওনা দিয়ে তায়েফ অবরোধ করেন। তায়েফ অবরোধের বিষয়টি বর্ণনা করার আগে এই তায়েফ সম্পর্কে পেছনের কিছু আলোচনা করা সঙ্গত হবে বিধায় একটু পেছনের আলোচনায় ফিরে যাই। যে আলোচনাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, হৃদয়স্পর্শী।

এটা হল সেই তায়েফ যেখানে মহানবী (সা.) ইসলামের প্রথম দিকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং তায়েফবাসীদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন। সে অত্যাচারের মাত্রাটা এমনই ছিলো যে আল্লাহর রাসূল (সা.) শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবের এই অবস্থা দেখে ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য। তায়েফ ছিল মক্কা থেকে ৫০ থেকে ৬০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটা সুন্দর স্থান এবং একটা গ্রীষ্মকালীন বিশ্রাম কেন্দ্র। সেখানে প্রত্যেকটি গ্রামে বসবাস করতো একটি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী অথবা গোত্র। তারা অতিথিপরায়ণ ছিল। তারা মেহমানদেরকে সম্মান করতো। আল্লাহর রাসূল মদীনায় হিজরত করার আগে যখন মক্কার কোরাইশদের দ্বারা প্রচ কষ্টের মুখোমুখি হচ্ছিলেন, তখন তিনি ভাবলেন, তায়েফবাসীরা যেহেতু অতিথিপরায়ণ, তাই সেখানে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলে তায়েফবাসীরা তাঁকে হয়তো সহজভাবেই গ্রহণ করবে। তাই তিনি তায়েফে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি হযরত যায়দ (রা.)কে সাথে নিয়ে তায়েফ অভিমুখে রওনা দিয়ে সেখানে পৌঁছালেন এবং সেখানকার তিনজন সরদার গোত্রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। তারা সব বিষয় অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে অত্যন্ত অসৎ ব্যবহার শুরু করে দিল। তারা একেকজন একেক রকম ব্যঙ্গ করে কথা বলতে লাগলো। যেমন একজন বলল, আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না, তোমাকে পয়গম্বর বানালেন? আরেকজন গোত্র প্রধান রাসূলের (সা.) সাথে কথা

www.pathagar.com

বলতেই অস্বীকৃতি জানালেন। রাসূল (সা.) সে সময় তায়েফে দশদিন ছিলেন। তিনি আরও অনেকের কাছেই গেলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই দ্বীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে বললো, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। মহানবী (সা.) মক্কায় ফেরার পথে তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদেরকে উস্কে দিল, গু া-বদমাশদেরকে এবং অজ্ঞ গোলামদেরকে রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা রাসূল (সা.) এর পেছনে পেছনে গালিগালাজ করতে করতে আসতে লাগলো এবং ঢিল আর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। এতে আল্লাহর রাসূলের পা দুটো রক্তাক্ত হয়ে গেল। রক্তে তাঁর জুতো ভরে গেল। আল্লাহর রাসূল (সা.) পড়ে গিয়েছিলেন। দুর্বৃত্তরা তাঁকে উঠিয়ে আবার হাঁটতে বাধ্য করেছিল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) সাধ্যমত রাসূল (সা.)কে আগলে রাখার চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনিও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) অনেক আশা নিয়ে তায়েফে এসেছিলেন বলে তিনি মানসিকভাবে প্রচ কষ্ট পেলেন। এই ঘটনায় আল্লাহর রাসূল (সা.) এত কষ্ট পেয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত আবেগ নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনাটি ছিল এরকম—"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার নিজের দুর্বলতা, অসহায়তা, উপায়হীনতা এবং লোকের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে ফরিয়াদ করছি। দয়ালু দাতা, তুমি দুর্বলদের প্রভু, আমার মালিকও তুমিই; তুমি ছাড়া আমারতো আর কেউ নেই। তুমি আমাকে কার হাতে ন্যস্ত করেছো? যারা রুক্ষ, কর্কশ ভাষায় আমাকে জর্জরিত করবে তাদের হাতে? তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাকো তাহলে আমার কোনো দুঃখ নেই, আফসোস নেই। তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত করো। তোমার যে পূণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠে সেই জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করে আমার প্রতি তোমার ক্রোধ অবতীর্ণ না হওয়ার এবং তোমার অসন্তুষ্টির কারণ না হওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছি। তুমি শক্তি দান না করলে সৎ কাজ করার এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আমার নেই।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে এতই কষ্ট পেয়েছিলেন যে বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, একদিন আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওহুদের যুদ্ধের চাইতেও কঠিন কোনো দিন আপনার জীবনে উপস্থিত হয়েছিল কি? তখন আল্লাহর রাসূল তায়িফবাসীদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে বললেন, সবচেয়ে ভয়াবহ দিন ছিল তায়েফের দিন।

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে কষ্ট পাওয়ায় এবং তাঁর এই প্রার্থনার পর আল্লাহ তায়ালা পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠালেন। হযরত জিবরাইল (আ.) এসে রাসূলকে সালাম দিয়ে বললেন, আপনার

www.pathagar.com

কওম আপনাকে যা যা বলেছে আল্লাহতায়ালা সবই শুনেছেন। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠানো হয়েছে। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতারা রাসূল (সা.)কে সালাম দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে দুই পাহাড়কে একত্রিত করে কাফিরদেরকে নিষ্পেষিত করে দেব। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এ অবস্থাতেও তায়িফবাসীদের জন্য বদদুআ করেননি বরং সাথে সাথে ফেরেশতাদেরকে বললেন, না, আমি আশা করি ওদের বংশধরদের মধ্যে আল্লাহতায়ালা এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। জীবনের সবচাইতে বড় কষ্টটা পেয়েও তিনি তাদের জন্য দু'আ করেছেন। এজন্যই তিনি রাহমাতাল্লিল আলামিন ছিলেন। এটা সেই তায়েফ যে তায়েফকে আল্লাহর রাসূল এবার অবরোধ করলেন।

খয়বরের দুর্গগুলো জয় করার পর তায়েফ ছিল দ্বিতীয় স্থান যেখানে মোহাম্মদ (সা.)কে প্রাচীর বেষ্টিত শহরের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমে এখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য পাঠানো হয় এরপর মহানবী (সা.) নিজে রওনা হন। পথে নাখলা, ইমানিয়া এবং কারণ মনযিল অতিক্রম করেন। লিয়াহ নামক জায়গায় মালেক ইবনে আওফের একটি দুর্গ ছিলো। রাসূল (সা.) এর নির্দেশে সেই দুর্গ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এরপর সফর অব্যাহত রেখে তায়েফ পৌছার পর রাসূল (সা.) তায়েফ দুর্গ অবরোধ করেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা অনুযায়ী এ অবরোধ ৪০ দিন স্থায়ী হয়। অবরোধের মধ্যে উভয়ের মধ্যে তীর এবং পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু আহত হন এবং ১২ জন শহীদ হন। শত্রুরা তাদের দুর্গের ভেতরে সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল, স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। তারা খাদ্য মজুদ করে রেখেছিল। যে কারণে তাদের আত্মসমর্পনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। শত্রুরা শহরের বাইরে এসে হাতাহাতি যুদ্ধে অংশ নিতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা ভিতর থেকেই তীর নিক্ষেপ করে মাঝে-মধ্যে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হচ্ছিল। মহানবী (সা.) এর সাথে কাঠ বা তক্তা ছিল। যেগুলোকে তাঁবুর চারিদিকে খাড়া করে দেয়া হয়েছিল। অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) অবরোধ অবসানের সিদ্ধান্ত নেন। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কৌশল অবলম্বন করা হয়। ঘোষণা দেয়া হয় যে, শত্রুর দুর্গ থেকে যে দাস-ই বের হয়ে এসে ইসলামী বাহিনীর কাছে আশ্রয় নেবে, সে মুক্তি পাবে। এতে ত্রিশজন লোক দুর্গ থেকে পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে শামিল হয়েছিল। তাদের কাছেই জানা গেল যে, অবরোধ এক বছর স্থায়ী হলেও শত্রুরা সংকটজনক অবস্থায় পতিত হবে না। তাই রাসূল (সা.) এ সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে আরও যে কারণগুলো ছিল তা হলো শাওয়াল মাস শেষ হয়ে যিলক্বদ মাস চলে এসেছিল। আর যিলক্বদ মাসে যুদ্ধ করা আরবদের দৃষ্টিতে হারাম ছিল।

www.pathagar.com

এছাড়া হজ্ব অনুষ্ঠান ঘনিয়ে এসেছিল। এর আগে হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতা মক্কার মুশরিকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। কিন্তু এবারই প্রথম সেটা পরিচালিত হবে মুসলমানদের দ্বারা। হজ্ব ছিল ঐ এলাকার অধিবাসীদের এক বিশাল মহাসমাবেশ এবং সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও তাওহীদী আদর্শের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করারও সর্বোত্তম মৌসুম। মহানবী (সা.) প্রথমবারের মতো তাঁর হাতে আসা এ সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন। কারণ এটি ছিল ঐ মুহূর্তে কোনো দূর্গ জয় করার চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সব দিক বিবেচনা করে মহানবী (সা.) তায়েফ অবরোধ উঠিয়ে নেন এবং সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে জি'ইরানায় চলে যান যেখানে হুনাইন যুদ্ধের গণীমত ও যুদ্ধ বন্দীদের রাখা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি একটি শিবির স্থাপন করলেন, কয়েক সপ্তাহ থাকলেন এবং হুনায়ন ও আওতাস থেকে প্রাপ্ত গণিমতের মাল সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। গণিমতের মালামাল বণ্টন করা নিয়ে কেউ কেউ একটু মনোক্ষুন্ন হলো, আনসারদের মধ্যে একটু বিরোধের উদ্ভব ঘটেছিল। সে আলোচনাটিও পরবর্তীতে আসবে।

তায়েফ অবরোধের সফলতাঃ

তায়েফ অবরোধ সফল হলো না কিংবা একেবারেই ফলাফল অর্জন হলো না, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ তায়েফে আশ্রয় নেয়া হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করলো। এই পরাজিত হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরাই মহানবীকে ধাত্রী মাতা উপহার দিয়েছিল। এইজন্য তারাও মনে করতো যে, যদি তারা ইসলামের ক্ষতি না করে, বিরোধীতা না করে তাহলে যে শিশুকে তারা লালন-পালন করেছে তার কাছ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। তারা মুসলমান হওয়ার পর মহানবী (সা.) বললেন, আমি এতগুলো সপ্তাহ ধরে গণিমতের মালামাল ভাগ-বাটোয়ারা থেকে বিরত ছিলাম শুধু এই আশায় যে, আপনারা অনুতপ্ত হবেন এবং এর ফলে আমি আপনাদের কাছে আপনাদের পরিবার এবং গবাদি পশুগুলো ফেরত দিতে পারবো। কিন্তু এখন দেরী হয়ে গেছে। এরপরেও আল্লাহর রাসূল তাদেরকে গণিমতের কিছু কিছু মাল ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাদের পরিবার-পরিজন, তাদের দাস-দাসী, গোলাম তাদেরকে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। এর অর্থ দাঁড়ালো, তায়েফবাসীরা তাদের সর্বশেষ মিত্র হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এরমধ্যে তায়েফের চারদিকে ইসলামের প্রভাব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে তায়েফে উৎপাদিত পণ্যের একমাত্র বাজার ছিল মক্কা, কিন্তু সেই মক্কাও ছিল তখন মুসলমানদের দখলে। মুসলমানদেরকে এড়িয়ে তাদের বাণিজ্য বহর বাইরে কোথাও যেতে পারতো না। ফলে তারা এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাধ্য হল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে প্রতিনিধি দল পাঠাতে এবং

www.pathagar.com

তাদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক আত্মসমর্পনের কথা জানাতে। তারা তাদের নিজের হাতের তৈরি দেবতার দাসত্ববৃত্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে অনুধাবন করতে পারল যে, আল্লাহ্ হলেন একজন এবং উপাসনা তাঁরই প্রাপ্য। তারা মুসলমান হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর রাসূল তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগালেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদেরকে নিযুক্ত করলেন।

গণীমতের মাল বণ্টন নিয়ে একটু বিরোধ এবং রাসূলের (সা.) সমাধানঃ

তায়েফ থেকে জি'ইরানাতে রাসূল (সা.) ফিরে গেলেন গণীমতের মালামাল বণ্টন করার জন্য। হুনায়নের যুদ্ধে বিশাল দৃষ্টি আকর্ষণকারী যত গণীমতের মাল মুসলমানদের দখলে এসেছিল তা বিগত আর কোনো যুদ্ধে মুসলমানরা অর্জন করতে পারেনি। মহানবী (সা.) এই বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। কারণ এমন বহু মানুষ আছে যারা বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে চলে না, বরং চলে পেটের পথে। রাসূলুল্লাহ (সা.) চাইলেন এই নব দীক্ষিত মুসলমানরা যেন সম্পদে সন্তুষ্ট থাকে আর প্রকৃত মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে থেকে যেন ঈমান শেখার সুযোগ পায় এবং ইসলামের প্রতি ভালোভাসা জন্মে। এজন্য এই ব্যাপক পরিমাণ গণীমতের মাল রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকেই বেশি দিলেন যারা নতুন মুসলমান হয়েছিলেন। তারা রাসূলের কওমের লোক ছিল। অন্যদিকে আনসারদেরকে দিলেন না যারা সবসময় রাসূলের পাশে ছিলেন। সংকটকালে তাদেরকে ডাকা হয়েছিল এবং তারা দ্রুত হাজির হয়েছিলেন। তারা রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে, দৃশ্যমান পরাজয় বিজয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু গণীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে তারা লক্ষ্য করলেন যে, সংকটের সময় পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের হাত পরিপূর্ণ কিন্তু তাদের হাত খালি। যে কারণে নব দীক্ষিতদের এত বেশি পরিমাণ মাল বণ্টন করায় কেউ কেউ একটু অসন্তুষ্ট হলেন। আনসারদের মধ্যেও কেউ কেউ একটু অসন্তুষ্ট হলেন। নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা চলল। এমন কথাও উঠলো যে মহানবী (সা.) নিজের গোত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে আপনি যা করেছেন এতে আনসারদের কেউ কেউ খুশী হয়নি। তারা সমালোচনা করছে। আল্লাহর রাসূল বললেন, তাদেরকে একত্রিত করো। সা'দ তাদেরকে একত্রিত করলেন। আল্লাহর রাসূল আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যারা তাঁকে তাঁর দুঃসময়ে সাহায্য করেছিল, সেই আনসারদের সাথেই তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন, মক্কায় থাকবেন না। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই অবহিত ছিলেন না। তারা ভেবেছিলেন রাসূল (সা.) তাঁর গোত্রের সাথে মক্কাতেই থেকে যাবেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা.) সমবেত আনসারদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এসব কথা বলেছ? আনসাররা মিথ্যা বলতো না, তারা বললেন–"আপনি যা শুনেছেন সেটা সত্য।" অন্য বর্ণনায় আছে যে, আনসাররা বললেন, আমাদের মধ্যে কোনো জ্ঞানী লোক এ কথা বলেনি। শুধু কিছু যুবক বলেছে। রাসূল বললেন, "হে আনসারগণ, এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন? তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে, আমার দ্বারা তোমাদেরকে একতাবদ্ধ করেছেন? তোমরা দরিদ্র ছিলে, আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন? আনসাররা উত্তর দিলেন, "নিশ্চয় আমাদের প্রতি আল্লাহ ও তার রাসূলের অনেক বড় দয়া।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তোমরা এ কথাও বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন সময় এসেছিলেন যখন আপনাকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল, সে সময় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনাকে বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, সে সময় আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, আমরা আপনাকে ঠিকানা দিয়েছি, আপনার দুঃখ লাঘব করেছি।

হে আনসাররা তোমরা দুনিয়ার তুচ্ছ কয়েকটা জিনিসের জন্য নাখোশ হলে। আমি তো এগুলো ওদেরকে দিয়ে কিছু লোকের মনে প্রবোধ দিয়েছি যেন তারা খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। তোমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই তো এগুলো তোমাদেরকে দান করিনি। হে আনসাররা, তোমরা কি এতে খুশী নও যে অন্যরা উট বকরি এসব নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঘরে ফিরবে?

আনসাররা ভেবেছিল রাসূল (সা.) বুঝি তাদের সাথে আর থাকবেন না। কিন্তু এই ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তারা আনন্দে কাঁদতে লাগলো। তারা বারবার বলতে লাগলো, আমরা সন্তুষ্ট; আমরা সন্তুষ্ট; হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সর্বান্তকরণে সন্তুষ্ট। বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, এরপর আল্লাহর রাসূল আনসারদের জন্য দোয়া করলেন এবং আনসার সাহাবীদের সাথে মদীনায় ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

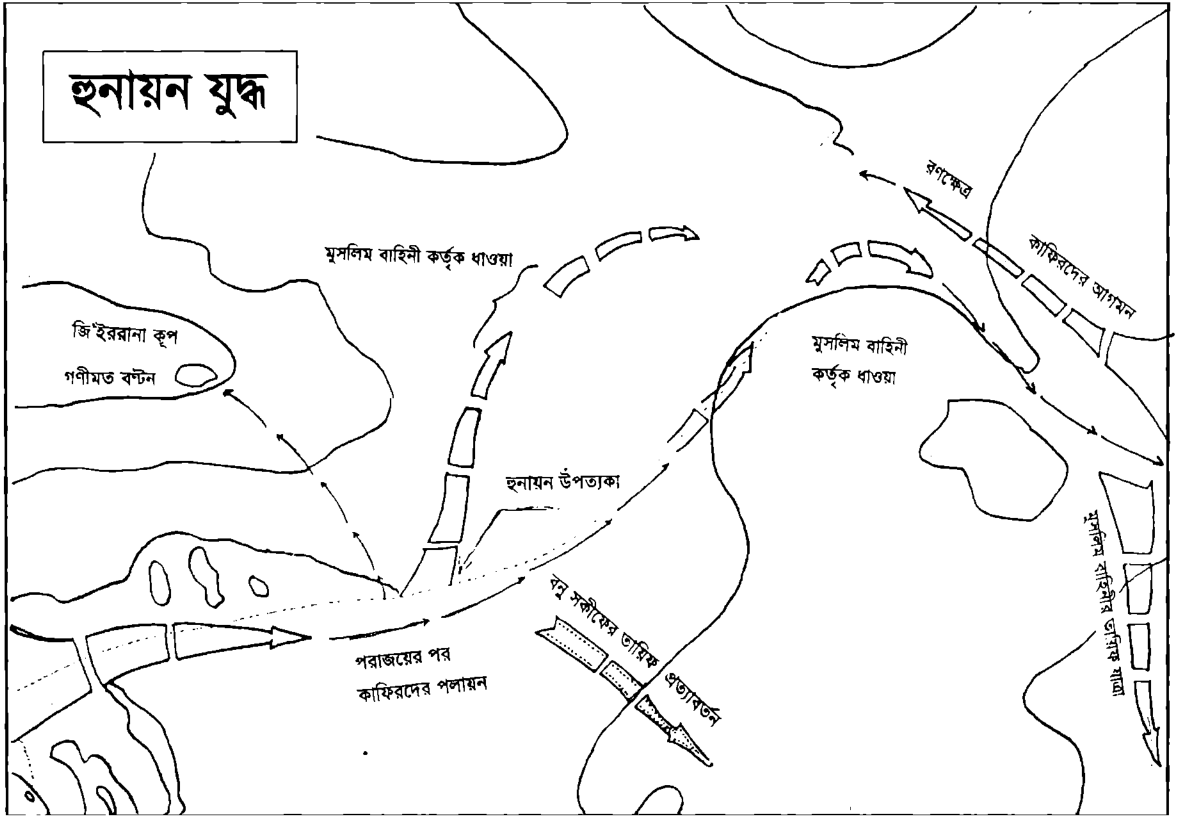

পশ্চিম

পূর্ব

www.pathagar.com

উত্তর

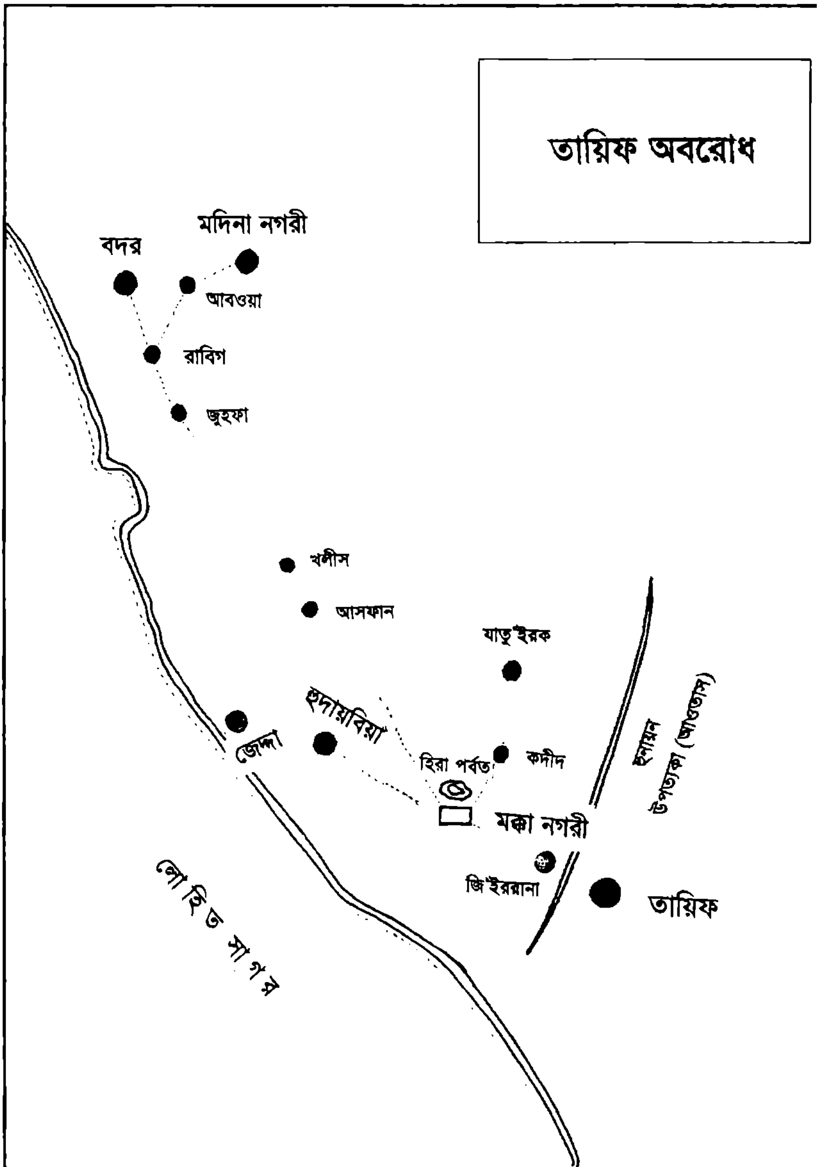

দক্ষিণ

www.pathagar.com

তাবুকের যুদ্ধ

ভূমিকাঃ

ইসলামের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে যে যুদ্ধগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাবুকের যুদ্ধ হল তার মধ্যে অন্যতম। মহানবী (সা.) অনেকগুলো যুদ্ধতেই সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবে এটিই ছিল মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বে সর্বশেষ সামরিক অভিযান। অন্যান্য যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য থেকে এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যে একটা ব্যতিক্রম ছিল। ব্যতিক্রমটি হলো, পূর্বের সমস্ত যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সা.) একটি কৌশল অবলম্বন করতেন। তিনি যুদ্ধের বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করতেন। যাতে রক্তপাতহীন বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু এ যুদ্ধের ব্যতিক্রম হলো, গোপনীয়তা রক্ষার নীতি ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, এবার রোমকদের সাথে যুদ্ধ হবে। আমরা আলোচনা করলে বুঝতে পারবো, কিভাবে হয়েছিল এই তাবুক অভিযানটি।

তাবুকের অবস্থানঃ

মদীনা এবং সিরিয়া বা দামেস্কের মাঝামাঝি মদীনা থেকে চৌদ্দ মন্‌যিল দূরে অবস্থিত একটা প্রসিদ্ধ জায়গার নাম তাবুক। এই নাম অনুসারেই এই অভিযানের নাম হয় তাবুক অভিযান। তখনকার সিরিয়া 'প্রাচ্য রোমান' সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ছিল।

তাবুকের যুদ্ধের গুরুত্ব বা প্রভাবঃ

তাবুকের এই যুদ্ধটিও ছিলো ইসলামের ইতিহাসের আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। কারণ এই যুদ্ধের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের সূরা তওবাতে প্রচুর সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ হাদীস রয়েছে। কিছু আয়াত এসেছে যুদ্ধে রওনা হওয়ার আগে এবং কিছু যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসার পরে। এসব আয়াতে যুদ্ধের অবস্থা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিছু আয়াতে সরলপ্রাণ মুজাহিদদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, কিছু আয়াতে মুনাফিকদের চেহারা উন্মোচন করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কোরআনের আয়াত এবং হাদীসের সে আলোচনাগুলো

www.pathagar.com

আসবে। এই যুদ্ধেও গতানুগতিক যুদ্ধের মতো কোনো সংঘর্ষ হয়নি। মু'তার যুদ্ধের মতোই এখানেও শত্রুরা মুসলমানদের কথা চিন্তা করেই আগেই মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল। মুসলমান বাহিনী তাবুক থেকে সফল এবং বিজয়ের বেশে ফিরে এসেছিল। ফলে এই যুদ্ধ জাযিরাতুল আরবের ওপর মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার এবং শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পৌত্তলিক এবং মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল, কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কারণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল রোমক শক্তি। এ যুদ্ধের ফলে তাদের সে আশাও ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। জনসাধারণ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, এখন থেকে জাযিরাতুল আরবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো শক্তির অস্তিত্ব থাকবে না।

তাবুকের যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ:

যুদ্ধের এ সময়টি ছিল ৬৩০ খৃস্টাব্দে (আগস্ট মতান্তরে অক্টোবর মাসে)। তাবুক এবং হুনায়নের যুদ্ধের পূর্বে মক্কা বিজয় ছিল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত মূলক অভিযান। মক্কা বিজয়ের পর সে সময় মহানবী (সা.) এর নবুয়ত ও রেসালাত সম্পর্কে আর কারো কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট ছিল না। এ জন্য মক্কা বিজয়ের পর পরিস্থিতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল। জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। বিভিন্ন প্রতিনিধি দল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসতে শুরু করেছিল। ঐতিহাসিকরা ৭০টির বেশি প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে কিছু প্রতিনিধি দল এসেছিল মক্কা বিজয়ের আগে, বাকীগুলো এসেছিল মক্কা বিজয়ের পরে। কয়েকটি প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ করছি। যেমন এসেছিল আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল, দাওস প্রতিনিধি দল, ফারওয়াহ ইবনে আমর জোযামির পয়গাম প্রেরণ, আবি সালমার আগমন, ছাদা প্রতিনিধি দল, আজরা প্রতিনিধি দল, বিলি প্রতিনিধি দল, সাকীফ প্রতিনিধি দল, হামদান প্রতিনিধি দল, বনি ফাজারা প্রতিনিধি দল, নাজরান প্রতিনিধি দল, বনি হানিফা প্রতিনিধি দল, তাজিব প্রতিনিধি দল, তাঈ প্রতিনিধি দল ইত্যাদি। এসব প্রতিনিধি দলগুলো ছিল প্রভাবশালী যারা এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল অথবা মুসলমানদের প্রতি আনুগত্য করে চুক্তি করছিল। এসব কারণে ভবিষ্যতে নিজেদের বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে যে শক্তিটি মদীনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল, তারা ছিল রোমক শক্তি। যারা কোনো উস্কানি ছাড়াই মুসলমানদের সাথে গায়ে পড়ে বিবাদ বাধাতে চাচ্ছিল। তখন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কন্সট্যান্টিনোপল নগরী (অধুনা তুরস্কের ইস্তাম্বুল)। সমকালীন বিশ্বে এরা কেবল ইরানের (পারস্যের) প্রতিপক্ষ বলে গণ্য হতো। এরাই ছিল সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। মুসলমানদের সাথে তাদের এই বিবাদের

www.pathagar.com

ভূমিকাটা তৈরি হয়েছিল মু'তার যুদ্ধে, শেরহাবিল ইবনে আমর গাসসানির হাতে। মু'তার যুদ্ধের অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। ইসলামের যখন প্রসার ঘটছিল তখন মহানবী (সা.) তাঁর দূত পাঠিয়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এই সময় এই শেরহাবিল মহানবী (সা.) এর দূত হারেস ইবনে ওমায়ের আযদিকে হত্যা করেছিল। যে দূতকে আল্লাহর রাসূল বসরার গবর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। দূত হত্যা করা পৃথিবীর সব দেশেই, সব কালের জন্যই ছিল একটা বড় ধরণের অন্যায়। তাই প্রতিবাদস্বরূপ আল্লাহর রাসূল তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠালেন রোমক ভূমিতে। যেখানে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার জন্য তারা পাঠালো এক লক্ষের এক বিশাল সৈন্য বাহিনী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সামান্য এই তিন হাজার মুসলমানকে পরাজিত করতে পারলো না বরং উল্টো মুসলমান সম্পর্কে একটা ভয় নিয়ে ফিরে গেল। যে যুদ্ধের ঘটনাটি সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে শত্রুদের মনের শক্ত অবস্থানের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী আরব এবং দূরবর্তী অঞ্চল সর্বত্রই এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল।

কায়সারের রোম এ সকল প্রভাব প্রতিক্রিয়া এবং এর পরিণাম উপেক্ষা করতে পারেনি। রোমান সম্রাট অদূর ভবিষ্যতে নিজের সাম্রাজ্যের নড়বড়ে অবস্থা এবং ধ্বংস দেখতে পেয়েছিল। তাছাড়া মুসলমানদের এই উত্থান দেখে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে স্বাধীনতা চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটেছিল। এটা ছিল রোমকদের জন্য বিপদজনক একটা অবস্থা। স্বাধীনতাকামী এইসব গোত্রগুলো সীমান্ত এলাকায় রোমকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে সিরিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ কারণে তারা ভাবলো যে, মুসলমানদের শক্তি বিপদজনক হওয়ার আগেই এদেরকে দমন করতে হবে এবং নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এসব কারণে মূতার যুদ্ধের এক বছর যেতে না যেতেই রোমের অধিবাসী এবং রোমের অধীনস্থ আরব এলাকাসমূহ থেকে তারা সৈন্য সমাবেশ শুরু করলো। এটা ছিল মুসলমানদের সাথে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রস্তুতি। তারা ইসলামকে এবার পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য বড় রকমের সৈন্যদল গঠন করার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে খুব ব্যস্ত করে তুললো।

শত্রুদের রওনা, সৈন্য সমাবেশ এবং প্রস্তুতির খবরঃ

এ সময় মদীনায় পর্যায়ক্রমে খবর আসছিলো যে, রোমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এ খবর পেয়ে মুসলমানদেরকে খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হচ্ছিল। তারা সব সময় ভাবতেন রোমকরা বুঝি এসে পড়েছে। এ সময় সিরিয়া থেকে তেল আনতে যাওয়া একটা গোত্রের কাছে খবর পাওয়া গেল যে,

www.pathagar.com

হিরাক্লিয়াস ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বাহিনী তৈরি করেছেন এবং রোমের এক বিখ্যাত যোদ্ধা সেই বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন। সেই কমান্ডার তার অধীনে খৃষ্টান গোত্রদেরকে সমবেত করেছে এবং অগ্রবর্তী বাহিনী 'বালকা' নামক জায়গায় পৌঁছে গেছে। এসব কারণে মুসলমানদেরকে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হচ্ছিল।

মহানবীর (সা.) সিদ্ধান্তঃ

আল্লাহর নবী এ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, এমন সংকট সময়ে যদি রোমকদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে শৈথিল্য ও অলসতার পরিচয় দেয়া হয় তাহলে রোমকরা মুসলিম অধিকৃত ও অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করবে। ফলে ইসলামের দাওয়াত, প্রচার এবং প্রসারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। মুসলমানরা সামরিক শক্তির স্বাতন্ত্র হারাবে। হুনায়নের যুদ্ধে পর্যুদস্ত শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। যে সব মুনাফিকরা বাইরের শক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তারাও পিঠে ছুরিকাঘাত করবে। অর্থাৎ পেছনে থাকবে মুসলমানদের সাথে মিশে থাকা মুনাফিক আর বাইরে থাকবে বিধর্মী সৈন্যদল। এতে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে যে শ্রম-সাধনা সেটা ব্যর্থতার মুখোমুখি হবে। নবী এবং সাহাবীদের দীর্ঘদিনের কষ্টের ফলে, ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে যে সফলতা এসেছে সেটা বিফলে যাবে। তাই আল্লাহর রাসূল (সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম অধিকৃত ও অধ্যুষিত এলাকায় বিধর্মীদের প্রবেশের সুযোগ দেয়া তো দূরের কথা, বরং তাদের এলাকাতে গিয়েই আঘাত করা হবে।

নাজুক পরিস্থিতিতে মুমিনদের স্বতস্ফূর্ততা এবং মুনাফিকদের অপতৎপরতাঃ

তাবুক যুদ্ধ ছিল মুনাফিক ও ঈমানের মিথ্যা দাবীদারদের থেকে প্রকৃত আত্মোৎসর্গকারীদের শনাক্ত করার সর্বোৎকৃষ্ট মানদ । কারণ সাধারণ জনতাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা তখনই দেয়া হয়েছিল যখন খুব গরম পড়ছিল। দেশে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাও ছিল। উট, ঘোড়া প্রভৃতি যানবাহনের সংখ্যা ছিল কম। রাস্তা ছিল অনেক দূরের এবং পথ ছিল দুর্গম। অন্যদিকে ফল পাকার সময় হয়েছিল। তাই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সময়টা ছিল একটু অসুবিধাজনক। মুনাফিকরা সেই সুযোগটা গ্রহণ করলো। তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থেকে নিজেদের চেহারা উন্মোচিত করল। তারা বিভিন্ন অপপ্রচারেও লিপ্ত হল। যারা অজুহাত দেখাচ্ছিল তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আয়াত নাজিল হলো। সূরা তওবার ৪৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "*ওয়া মিনহুম মাই ইয়াকূলু জাঁল্লী ওয়ালা তাফতিন্নী; আলা ফিল ফিতনাতি ছাক্কাত; ওয়া ইন্না জাহান্নামা লা মুহীত্বাতুন বিল কাফিরীন।*" অর্থাৎ, "এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক বলে, আমাকে অবসর দিন এবং

www.pathagar.com

আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। শুনে রাখ, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে রয়েছে। আর জাহান্নাম এই কাফিরদের ঘিরে রেখেছে।" মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী গরমকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করালে *সূরা তওবার ৮১ নম্বর আয়াতে* আল্লাহ তায়ালা বলেন, *"ফারিহাল মুখাল্লাফুনা বিমাকআ'দিহিম খিলাফা রাসুলিল্লাহি ওয়া কারিহু আইঁইউজাহিদু বি আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুছিহিম ফি সাবিলিল্লাহি ওয়াক্বালু লা তানফিরু ফিল হাররি কুল নারু জাহান্নামা আশাদ্দু হাররা; লাউকানু ইয়াফকাহুন।"* অর্থাৎ, "পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে, আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, তোমরা এই গরমের সময় যুদ্ধে যাত্রা করো না। আপনি বলে দিন, জাহান্নামের আগুন এ গরম আবহাওয়ার চেয়েও অত্যাধিক উষ্ণ, যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত"

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করলেন। এ ধরণের কঠিন সময়ে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের পরীক্ষা করেন। এই যুদ্ধে সকল মোমিন মুসলমানরাই অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মুনাফিকরা অপপ্রচার চালালো। ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম অনুরক্ত ভক্তদের মনে বিন্দুমাত্র শিথিলতা এলো না। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথেই সাহাবায়ে কেরাম পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হতে লাগলেন। মদীনার চারিদিক থেকেও আগ্রহী মুসলমানরা এসে যোগ দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এইবার বিরাটভাবে আয়োজন করলেন। তিনি আরব গোত্রদেরকে অর্থ এবং সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার আহ্বান জানালেন। সাহাবীরা এবং অন্যান্য মুসলমানরা আল্লাহর রাস্তায় অর্থ দেয়ার এই মহাসুযোগকে কাজে লাগালেন। সদকা-খয়রাতের দিক থেকে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। মহিলারাও তাদের গলার হার, হাতের বালা, আংটি, জুমকা, বালি, ইত্যাদি সাধ্যমাফিক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে দিয়ে দিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দুইভাগে ভাগ করে অর্ধেক অর্থাৎ একভাগ এনে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে হাজির করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর যথাসর্বস্ব এনে রাসূলের (সা.) হাতে সমর্পন করলেন। হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর বহু ধন সম্পদ নিয়ে আসেন। হযরত ওসমান (রা.) সর্বাধিক দান করেন। হযরত তালহা, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা এবং মোহাম্মদ ইবনে মোসলমাও অনেক ধন সম্পদ নিয়ে হাজির হন। আবার এমন সাহাবীও ছিলেন যারা এক মুঠ, দু'মুঠ করে সদকা করছিলেন। কারণ তাঁদের এর চাইতে বেশি দেয়ার সামর্থ্যও ছিল না। অথচ মুনাফিকরা বেশি দানকারীদেরকে খোঁটা দিল এই বলে যে, ওরা অহংকারী। আর কম দানকারীদের নিয়ে উপহাস করলো এই বলে যে, ওরা একটা দুইটা খেজুর দিয়ে কায়সারের দেশ জয় করতে চলেছে। এ ব্যাপারেও কোরআনের সূরা তওবায় ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *'আল্লাজীনা ইয়াল মিযূনাল মুত্ত্বাবিব'ঈনা মিনাল*

www.pathagar.com

মু'মিনীনা ফিচ্ছাদাক্বাতি ওয়াল্লাজীনা লা-ইয়াজ্বিদুনা ইল্লা জুহদাহুম ফাইয়াছখারূনা মিনহুম; ছাখিরাল লা-হু মিনহুম ওয়ালাহুম আজাবুন আলীম।' অর্থাৎ 'যারা আন্তরিক সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কথা বলে এবং তাদেরকে ঠাট্টা করে, যারা তাদের কাছে যা আছে তা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেই দান করে; তাদের প্রতি বিদ্রুপকারীদের প্রতি আল্লাহ্ বিদ্রুপ করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।'

এই যুদ্ধে মুসলমানদের ত্রিশ হাজার সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর আগে এত বড় সেনাদল আর তৈরি হয়নি। তাই অনেক দান-খয়রাতের পরেও এত বড় সৈন্য বাহিনীর জন্য অনেক কিছুই অপ্রতুল ছিল। যানবাহন কম ছিল, পাথেয় কম ছিল। মু'মিন সাহাবীরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর মুনাফিকরা অংশগ্রহণ করেনি। তবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা আরেকটি পক্ষ ছিল। যারা ছিল গরীব এবং ক্ষুধার্ত কিন্তু তাদের মনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের সরঞ্জাম অপ্রতুল হওয়ায় তারা যুদ্ধে যেতে পারেনি। তারা রাসূলের (সা.) কাছে এসে যানবাহনের ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল (সা.) অক্ষমতা প্রকাশ করলে তাঁরা রাসূলের কাছ থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিল। তাদের অন্তরের প্রশংসা করে আল্লাহ্ তায়ালা সূরা তওবার ৯২ নম্বর আয়াতে বলেন, *অলা-আলাল লাজীনা ইজামা~আতাওকা লিতাহমিলাহুম কুলতা লা~আজ্বিদু মা~আহমিলুকুম আলাইহি তাওয়াল্লাও ওয়া আয়ুনুহুম তাফিদ্বু মিনাদ্দাম'ই হাযানান আল্লা ইয়াজ্বিদু মা~ইউনফিকুন।* বাংলা অর্থ হল, "ওদের কোনো অপরাধ নেই, যারা তোমার কাছে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্য আমি কোনো বাহন পাচ্ছি না। ওরা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেল।" অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ হয়, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের অন্তরের ইচ্ছাটাও দেখেন, নিয়তটাও দেখেন।

তাবুক প্রান্তরে মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশ:

তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্যকে সুগঠিত করা হলো। এর মধ্যে দশ হাজার ছিল অশ্বারোহী। ইতোপূর্বে এত বেশি সৈন্য একসাথে করা হয়নি। এই তাবুকের যুদ্ধে যাত্রা করার পূর্বে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে (রা.) নিজের পরিবারবর্গের তত্ত্ববধানের ভার দিয়ে গেলেন আর পতাকা হাতে দিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর উপর। এই সর্বশেষ অভিযানে হযরত আলী (রা.)-এর উপর পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান এর দায়িত্ব এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর হাতে পতাকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যতে খিলাফত সমস্যার সমাধানের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশেই অংশগ্রহণ করলেন না। অথচ যুদ্ধে অংশ না নেয়া মুনাফিকরা অপপ্রচার চালালো। তারা বলল, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) এর প্রতি অসন্তুষ্ট, তাই সাথে নেননি। আবার কেউ কেউ বলল, এ যুদ্ধ যাত্রার কষ্টের কথা ভেবেই হযরত আলী (রা.) যুদ্ধে অংশ নেয়নি। এসব বলার কারণ ছিল, হযরত আলী (রা.) এর মত বীর মদীনায় থেকে যাওয়ায় মদীনা আর অরক্ষিত থাকলো না। ফলে মদীনায় ষড়যন্ত্রকারীদের পথের কাঁটা হয়ে থাকলেন হযরত আলী (রা.)। তাই তারা হযরত আলী (রা.)কে উত্যক্ত করে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছিল। হযরত আলী (রা.) মুনাফিকদের এসব কথাবার্তা শুনে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং পথে মহানবী (সা.) এর সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমর বিশারদ মহানবী (সা.) পুনরায় হযরত আলী (রা.)কে মদীনায় ফেরত পাঠালেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, তাবুক পৌছানোর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "আজ রাতে প্রবল বেগে ঝড় প্রবাহিত হবে। ঝড়ের সময় তোমরা কেউ দাঁড়িও না। আর যাদের উট আছে তারা যেন নিজ নিজ উট বেঁধে রাখে।" বাস্তবিকই রাত্রে প্রচ গতিতে ঝড় শুরু হল। এক ব্যক্তি ঝড়ের সময় দাঁড়িয়েছিলেন, ঝড়ের তা ব তাকে উড়িয়ে নিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফেলে দিয়েছিল। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ঘটনাটি জানতে পারলেন তখন তাঁর নির্দেশ লজ্ঞন এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যু তাঁকে ব্যথিত করল।

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাবুক পৌছিয়ে সেখানে তাঁবু স্থাপন করলেন। তিনি সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাহাবাদের অনুপ্রাণিত করলেন, সুসংবাদ দিলেন। এই ভাষণে মুসলমানদের মনোবল প্রচ ভাবে বেড়ে গেল। তাদের মধ্যে কোনো কিছুরই অভাব আছে বলে তাদের মনে হলো না। অন্যদিকে রোম এবং তাদের বাহিনীর অবস্থা এমন হলো যে, বিশাল মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে তারা প্রচ ভীত হয়ে পড়লো। সামনে এগিয়ে এসে মোকাবিলা করার সাহস করতে পারল না। তারা নিজেদের শহরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। আবার এরকমও বর্ণনা আছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়া আসছেন, এই সংবাদ পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে খৃষ্টান সেনাবাহিনী আগেই পালিয়েছিল। এ জন্য তাবুকে পৌছিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) শত্রুদের চিহ্নমাত্র দেখতে পাননি। তিনি সেখানে বিশ দিন অবস্থান করলেন। ওখানকার স্থানীয় সরদারগণ মুসলিম বাহিনীর ভয়ে বিচলিত হয়ে উঠলো। এ সময় সিরিয়াবাসী খৃস্টান শত্রুদের উপর আক্রমণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) অনায়াসেই যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এরকম কিছু করলেন না। পরবর্তী যেটা হল, 'আয়েলার' অধিপতি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে কর আদায়ের শর্ত মেনে নিয়ে একটি সন্ধি

www.pathagar.com

চুক্তি করলেন। এরপর 'জরবা' এবং 'আযরুহ' দলপতিরাও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বাৎসরিক কর আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। দামেশকের কাছে দূমাতুল জন্দলের অধিপতি ছিলেন উকাইদা। তিনি ছিলেন রোম সম্রাটের অধীনস্থ শক্তিশালী রাজা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসেননি। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) চারশত বিশ জন সৈন্যসহ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রা.) দুমাতুল জন্দলের শাসনকর্তার কাছে পাঠালেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) গেলেন এবং উকাইদার কিছু সৈন্যসহ উকাইদাকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এরপর উকাইদার সাথেও একটি চুক্তি হল। চুক্তি অনুযায়ী তিনি মুক্ত হলেন এবং কর দিতে রাজী হলেন এবং একইসাথে তার কাছ থেকে পাওয়া দুই হাজার উট, আটশত ক্রীতদাস, চারশত বর্ম এবং চারশত বর্শা মুসলমানদের আয়ত্তে এলো।

এই ঘটনার ফলে ওখানকার গোত্রসমূহ বুঝতে পারলো যে, রোমকদের পায়ের তলায় আর মাটি নেই। এবার প্রভু বদল হয়ে গিয়েছে। রোমকদের আনুগত্যের আর প্রয়োজন নেই। তাদের কর্তৃত্বের দিন শেষ। এ কারণে তারাও মুসলমানদের মিত্র হয়ে গেল। এমনি করে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত হয়ে রোমক সীমান্তের সাথে মিলিত হল এবং রোমকদের আধিপত্য অনেক কমে গেল।

মুনাফিকদের মসজিদ ধ্বংস এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা:

মুনাফিকরা সব সময় এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকতো যে কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও দলাদলীর সৃষ্টি করা যায়। এ জন্য কিছু বাহানা দাঁড় করিয়ে মসজিদের নামে তারা একটা ষড়যন্ত্রের আখড়া তৈরি করল। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং শত্রুদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছিল। যদিও তারা সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য রাসূল (সা.) এর কাছে এসে বলল, যারা মসজিদে নববী কিংবা মসজিদে কুবা পর্যন্ত যেতে পারে না এমন পীড়িত, বৃদ্ধ, দুর্বল লোকদের জন্য আমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি, আপনি দয়া করে একবার নামাজ পড়িয়ে এটির উদ্বোধন করে দিন। আল্লাহর রাসূল (সা.) সে সময় যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি তখন রাজী হলেন না, তবে তিনি বললেন ইনশাআল্লাহ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেই মসজিদে নামাজ আদায় করবো। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। কারণ তাবুক যুদ্ধ থেকে আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন ফিরে আসছিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য এবং নির্মাতাদের চক্রান্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে অবহিত করিয়ে দিলেন। সূরা তওবার ১০৭-১০৮ নম্বর আয়াতে বলা হল, *"ওয়াল্লাজীনাত্তাখাজু মাছজ্বিদান দ্বিরারাওঁওয়া কুফরাওঁ ওয়া তাফরীক্বাম বাইনাল মু'মিনীনা ওয়া ইরছাদাল*

www.pathagar.com

লিমান হারাবাল্লাহা ওয়া রাসুলাহু মিন ক্বাবল; ওয়া লাইয়াহলিফুন্না ইন আরাদনা ইল্লাল হুছনা; ওয়াল্লাহু ইয়াশহাদু ইন্নাহুম লাকা-জিবুন" অর্থাৎ "আর যারা ইসলামের ক্ষতি সাধন, কুফরী আলোচনা ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং পূর্ব থেকেই যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে তাকে (আবু আমির খৃস্টানকে) ওত পেতে বসার স্থান দেয়ার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করল। আর তারা কসম খেয়ে বলবে—মঙ্গল সাধন ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা মিথ্যা বলছে। হে মুহাম্মদ (সা.), আপনি কখনও উক্ত মসজিদে যেয়ে দাঁড়াবেন না। প্রথমাবস্থায় যে মসজিদের ভিত্তি আল্লাহ ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই মসজিদে (মসজিদে কুবায়) নামাজ পড়াই আপনার জন্য অধিক সমীচীন। উক্ত মসজিদে এমন লোকজন আছেন যাঁরা পবিত্রতা পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা পছন্দকারীদেরকে ভালোবাসেন।" এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুনাফিকদের চরিত্র পুরোপুরি উন্মোচিত হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল (সা.) ঐ মসজিদে নামাজ পড়ার পরিবর্তে হযরত মা'আন (রা.)কে পাঠিয়ে মসজিদটি ধ্বংস করে দিলেন। এ সময় মুনাফিকদের ব্যাপারে আরো কঠোরতা অবলম্বন করার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা দিলেন। যেমন তাদের দেয়া দান-খয়রাত গ্রহণ, তাদের জানাযার নামাজ আদায়, তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া এবং তাদের কবর যিয়ারত করতেও নিষেধ করা হল। একটি উদাহরণ দিই, তাবুকের যুদ্ধের পরেই মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যায়। মহানবী (সা.) তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে জানাযার নামাজ পড়াতে চাইলে হযরত ওমর ফারুক (রা.) আপত্তি করেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)কে মনে করিয়ে দেন যে, এই লোকটা মুসলমান হয়েও, আমাদের ভিতরে থেকেও আমাদের সাথে বেঈমানী করেছে, আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) দয়ালু ছিলেন বলে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হয়। কিন্তু আল্লাহতায়ালা এই সময় হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর বক্তব্যের সমর্থনে আয়াত নাজিল করে মুনাফিকদের জানাযা করতে নিষেধ করেন। সুরা তাওবাহ এর ৮০ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশে বলা হল, *ইস্তাগফির লাহুম আওলা তাস্তাগফিরলাহুম; ইন তাস্তাগফিরলাহুম ছাব'ঈনা মাররাতান ফালাই ইয়াগফিরাল্লাহু লাহুম;* অর্থাৎ তাদের জন্য তুমি ক্ষমা চাও কিংবা না চাও একই কথা; সত্তরবারও ওদের জন্য তুমি ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা তিনজনকে ক্ষমা:

যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৮০ বা এর কিছু বেশি। মসজিদে নববীতে এসে তারা যুদ্ধে যেতে না পারার বিভিন্ন ওযর বর্ণনা করছিল। মহানবী

www.pathagar.com

(সা.) তাদের বাইরের অভিব্যক্তি গ্রহণ করে বাইয়াত গ্রহণ করলেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করলেন এবং তাদের ভেতরের অবস্থা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেন। তিনজন মোমিন সাদেকীনের প্রসঙ্গ বাকী থাকলো। এরা হচ্ছেন কা'ব ইবনে মালেক, মারারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া। তারা সত্য কথা বললেন যে, আমাদের যুদ্ধে না যাওয়ার মতো কোনো কারণ ছিল না। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) সাহাবাদের বললেন, তারা যেন ওদের সাথে বাক্যালাপ না করেন। ফলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কট করা হল। তারা তখন বারবার আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা তওবার ১১৮ নম্বর আয়াত নাযিল হলো। বলা হল, *"অ'আলাছ ছালাছাতিল লাজীনা খুল্লিফু হাত্তা~ইজা দ্বা ক্বাৎ 'আলাইহিমূল আরদ্বু বিমা রাহুবাৎ ওয়া দ্বা-ক্বাৎ আলাইহিম আনফুছুহুম ওয়া জ্বাননু~আল্লা মালজ্বাআ মিনাল্লাহি ইল্লা~ইলাইহ; ছুম্মা তাবা আলাইহিম লিয়াতুবু; ইন্নাল্লাহা হুওয়াত তাওয়্যাবুর রাহীম।"* অর্থ: "যে তিন ব্যক্তির বিষয়টি মুলতবী রাখা হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের তওবা কবুল করলেন। যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।"

আল্লাহ পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণা হওয়ায় ঐ তিন সাহাবা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হযরত কা'ব (রা.) এই আনন্দে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার সমস্ত সম্পদ দান করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন। বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে, তিনি এ কথাও বললেন যে, সত্য কথা বলে আল্লাহর কাছ থেকে যখন পুরস্কার পেয়েছি তখন আর কখনও মিথ্যা কথা বলব না।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন:

নিজের দেশে বিজয়ের বেশে সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যের চাইতে ভালো কোনো দৃশ্য আর হয়না। মুসলমান বাহিনী তাবুক থেকে সফল এবং বিজয়ের বেশে মদীনায় ফিরে আসেন। তাই ইসলামের সৈনিকদের মন আন্দন্দ আর উৎসাহে ভরে গিয়েছিল। কারণ তারা একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রকে পেছনে হেঁটতে বাধ্য করেছিল এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে ঐসব এলাকার অধিবাসীদেরকে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। কোনো সংঘর্ষ সেখানে হয়নি। এ যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ছিলেন মোমিনদের জন্য যথেষ্ট। পথে এক জায়গায় একটি ঘাঁটিতে ১২ জন মুনাফিক মহানবী (সা.)কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তারা তাদের মুখম ল ঢেকে রাসূলের (সা.) পেছনে পেছনে নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে

www.pathagar.com

আসছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হযরত হোযায়ফাকে (রা.) পাঠালেন। হযরত হোযায়ফা (রা.) সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলেন। হোযায়ফা বলেন, 'আমি তাদের উটগুলোর চিহ্ন দেখে তাদেরকে চিনতে পেরেছিলাম এবং মহানবী (সা.)কে বলেছিলামঃ আমি আপনার কাছে তাদের পরিচিতি তুলে ধরব, যাতে আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু মহানবী (সা.) দয়াদ্রপূর্ণ কণ্ঠে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন তাদের নাম প্রকাশ থেকে বিরত থাকি। সম্ভবত তারা তওবা করতে পারে। তিনি আরো বললেন, 'আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করলে বিধর্মীরা বলবে, মুহাম্মদ শক্তি ও ক্ষমতার তুঙ্গে পৌছানোর পর নিজের সঙ্গী-সাথীদের গর্দানের উপর তরবারির আঘাত হেনেছে।'

তাবুক অভিযানে ৫০ দিন সময় লেগেছিল। এর মধ্যে ২০ দিন তিনি তাবুকে ছিলেন আর যাওয়া-আসায় লেগেছিল ৩০ দিন। তিনি মদীনায় আসছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বেরিয়ে পড়ে বিপুল উষ্ণতায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

আল্লাহর সাহায্যঃ

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো যুদ্ধেই সফলতা সম্ভব হয়নি। তাবুকের যুদ্ধেও সাহায্য এসেছে। কষ্টকর এ দীর্ঘ যুদ্ধ যাত্রার মধ্যে মুসলিম বাহিনী পানি সংকটে পড়লো। তাঁদের সংরক্ষিত পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর কাছে এসে বিষয়টি জানালেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) দোয়া করলেন। এরপর আকাশে মেঘ হলো, প্রচুর বৃষ্টি হলো। সাহাবারা তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করলেন। এছাড়া পূর্বেও যেটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ষড়যন্ত্রকারীদের অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা মসজিদ সম্পর্কেও আয়াত নাযিল করে বিষয়টি আল্লাহ তাঁয়ালা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটাও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য।

পর্যালোচনাঃ

রাসূলে করিম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে যে কেউ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল সামরিক কমান্ডার। পরিবেশ পরিস্থিতি, পটভূমি, প্রাসঙ্গিক লক্ষণসমূহ এবং পরিণতি ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় মেধার অধিকারী। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সবসময় রক্ষণাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, যতটা সম্ভব রক্তপাতহীন বিজয় অর্জনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মত করে সৈন্য সমাবেশ, যুদ্ধ পরিকল্পনা, অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর সমরকুশলতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বের সকল সেরা যুদ্ধ বিশারদের চেয়েও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ওহুদ এবং হুনায়নের যুদ্ধে যে সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছিল তার জন্য মুসলিম সৈন্যদের অবাধ্যতা আর ব্যক্তিগত দুর্বলতা দায়ী ছিল। আর এই উভয় যুদ্ধে পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) যে সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি শিখিয়েছিলেন কিভাবে বিপদজনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে মহানবী (সা.) মুসলিম সেনানায়কদের এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে গড়ে তোলেন। যার কারণে তাঁর হাতে সৃষ্টি করা এই সেনাবাহিনী পরবর্তীতে ইরাক, সিরিয়া, পারস্য, রোম প্রভৃতি জায়গায় পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করে এসব বড় বড় যুদ্ধবাজদের হার মানিয়ে দেয়। এটি হল তাঁর সামরিক গুরুত্বের দিক। কিন্তু এর বাইরেও আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিক হল, এ সকল যুদ্ধের মাধ্যমে মহানবী (সা.) শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। ফেতনা ফাসাদের আগুন নিভিয়ে দেন। শক্তি আর সামর্থ্যের অহংকারকে নস্যাৎ করে দেন। বাস্তুহীন, ঠিকানাহীন মানুষের সমস্যার সমাধান করেন। সেই অন্ধকার যুগে যেসব কারণে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতো, মহানবী (সা.) সেই কারণগুলোর পরিবর্তন করেন। সে সময় যুদ্ধ মানেই ছিল হত্যা, ধ্বংস, লুটতরাজ, যুলুম, অত্যাচার, প্রতিশোধ গ্রহণ, জনপদ বিরান করা, বাড়িঘর ভেঙে ফেলা, মহিলাদের সম্মান নষ্ট করা, পশু হত্যা করা, মোট কথা ক্ষতি ও ধ্বংস করাই ছিল এসব যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু ইসলামের এই যুদ্ধগুলো তাদেরকে শিখিয়েছিল যে, জেহাদ হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া, যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন থেকে মুক্ত করে সুবিচারমূলক ব্যবস্থা করা, দুর্বলদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই জাহেলিয়াতের নোংরা যুদ্ধ পাকসাফ হয়ে পবিত্র জেহাদে পরিবর্তিত হয়েছিল। এজন্য ইতিহাসে মহানবী (সা.) এর যুদ্ধের মত এত কম রক্ত ঝরানো, এত বেশি সাফল্য আর এত বেশি সমাজকে বদলে দেয়ার যুদ্ধ আর দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

উ ত্ত র

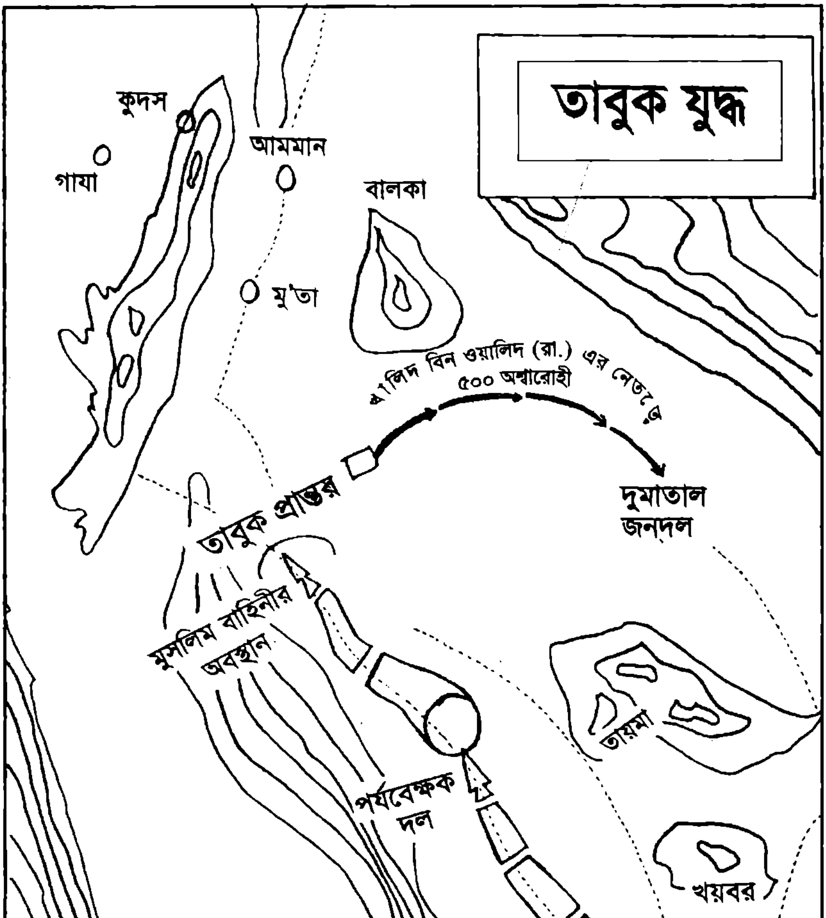

দ ক্ষি ণ

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম খলিফা
হযরত আবু বকর (রা.) শাসনামলের যুদ্ধ

ভূমিকাঃ

প্রিয় পাঠক, 'ব্যটল অব ইসলাম' এর এই গ্রন্থে ইসলামের যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর বর্ণনা এ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, সেগুলোর সবগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায়। অর্থাৎ তাঁর জীবিত অবস্থায়। বদরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত। ২/১টি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে না গিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছেন। বাকী সব যুদ্ধেই তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেছেন। তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধটিই ছিল তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশেষ সামরিক অভিযান। যে যুদ্ধে তৎকালীন বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেছিল। যে যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল সর্বত্র। যে যুদ্ধে বৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করার মাধ্যমে মুসলমানরা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, অচীরেই মুসলিম শক্তি বা ইসলামী শক্তি নামে পৃথিবীতে আরেকটি শক্তির আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে।

তাবুকের যুদ্ধের ২ বছর পরেই রাসূলুল্লাহ (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি রেখে গেলেন আল্লাহর বাণী কুরআন তাঁর হাদীস আর আজীবন সংগ্রাম সাধনার ফসল তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। রাসূলে করিম (সা.) নিজে তাঁর তেইশ বছরের নবুয়্যাতি জীবনে অবিশ্রান্ত সাধনা আর সংগ্রাম করে যে সমাজ, যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই রাষ্ট্র চালানোর দায়িত্ব আসে, নেতৃত্ব আসে চারজন প্রধান সাহাবীর হাতে। ইতিহাসে যাঁদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'। সেই চারজন প্রধান সাহাবী বা ইসলামের চার খলিফা হলেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)। তাঁরা তখন রাষ্ট্র পরিচালনা করা শুরু করলেন। তাঁদের শাসনামল বেশি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বিশ্বের ইতিহাসে সেই শাসনামল সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু মুসলমান ঐতিহাসিকগণই নন, অমুসলিমগণও এমনকি ইসলামের শত্রু ঐতিহাসিকরাও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলকে মানব ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

www.pathagar.com

বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) নিজেই এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। এরপর আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী তাবেয়ীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী তাবয়ে তাবেয়ীদের যুগ।

রাসূল (সা.) এর যুগের পরে খলিফাদের আমলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার ঘটে। সবচাইতে বেশি প্রসার ঘটে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর শাসনামলে। মক্কা-মদীনায় সূচনা হওয়া ইসলাম পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) অর্ধেক পৃথিবীর শাসনকর্তা ছিলেন। কিভাবে তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং একইসাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে বর্ণনাগুলো আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করব ইনশাআল্লাহ। এখানে এই খোলাফা-ই রাশিদীন বা ইসলামের চার খলিফার শাসনামলের সময়কালটি একটু উল্লেখ করে রাখি। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর শাসনকাল ছিল ৬৩২ থেকে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর শাসনামল ছিল ৬৩৪ থেকে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) এর শাসনামল ছিল ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ পর্যন্ত এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনামল ছিল ৬৫৬ থেকে ৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

এ অধ্যায়ের আলোচনা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর শাসনামল নিয়ে। তিনি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে সেই রাষ্ট্র কিভাবে চালানো শুরু করলেন, কিভাবে অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব নিরসন করলেন, ভ নবীর দাবীদারদের উৎখাত করলেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করলেন ইত্যাদি বিষয়ে। প্রসঙ্গক্রমে খলিফাদের শাসনামলে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গই আসবে। আলোচনা করতে গিয়েই আমাদেরকে বারবার রাসূল (সা.) এর যুগের আলোচনাতেও ফিরে যেতে হবে।

তবে যে খলিফাদের শাসনামল আমরা বর্ণনা করব, সেই বর্ণনার আগেই আমাদেরকে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, ইসলামে এসব খলিফাদের মর্যাদা কেমন ছিল? সাহাবীদের মর্যাদা কেমন ছিল? তাহলে বিষয়গুলোকে হৃদয়াঙ্গম করতে আমাদের সুবিধা হবে।

খলিফা এবং সাহাবীদের মর্যাদাঃ

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে সরাসরি মহানবী (সা.)কে নিয়েই আলোচনা হয়েছে। কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়া তিনিই ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক কমান্ডার, সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক সবকিছুই। এখন তাঁর অবর্তমানে

www.pathagar.com

ইসলামের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি দায়িত্ব নিলেন তিনি কেমন ছিলেন? অথবা তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যক্তিরা কেমন ছিলেন? সেটা আমাদের জানা থাকলে এ অধ্যায়গুলো বুঝতে এবং অনুধাবন করতে সহায়তা করবে।

আল্লাহর রাসূল (সা.) যে যুগে জন্মগ্রহণ করলেন সেটা ছিল অন্ধকারের যুগ, আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ, বর্বরদের যুগ। এমন কোনো অন্যায় ছিল না যা সেখানে হত না, এমন কোনো নৈতিকতা বিরোধী, মানবতা বিরোধী কাজ ছিল না যা সেখানে সংঘটিত হত না। সেই যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.) এলেন এবং সেই সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে দিতে চাইলেন। আজকের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেও একটু ভাবলে অনুমান করা যায় যে, একটা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে দেয়ার কাজটি সহজ না কঠিন? কঠিন হলে সেটা কত কঠিন? এই কঠিন দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন মিশন শুরু করলেন তখন কারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ নিয়ে এগিয়ে এলেন? যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদেরকে কী ধরনের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হল? একটি প্রচলিত, একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বাইরে বেরিয়ে আসার কারণে কতবড় ত্যাগ তাঁদেরকে করতে হল। কেউ তার নিজের গোত্র থেকে বেরিয়ে এলেন, কারো আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল, কাউকে নিজেদের লোকের হাতেই অপমানিত হতে হল, শারীরিকভাবে নির্যাতন পেতে হল, কাউকে বিতাড়িত হতে হল, আবার কাউকে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হল, কাউকে নিজের বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হল, কাউকে নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে হল। যাঁরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) মহব্বতে হাসিমুখে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তারা সঙ্গত কারণেই মর্যাদাবান। এ ব্যাপারে বুখারী শরীফে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরবর্তী যুগের লোকদের লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমান স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও সে আমার সাহাবীর এক মুদ (প্রায় এক সের) কিংবা আধা সের যব অথবা গম ব্যয় করার সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। জারীর আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ, আবু মুয়াবিয়া ও মুহাজির থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, কতবড় মর্যাদা ছিল আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাহাবীদের।

অন্য একটি হাদীস একটু আগেই বললাম, রাসূল (সা.) বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। এরপর আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী তাবেয়ীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী তাবয়ে তাবেয়ীদের যুগ।

ইমাম আহমদ, হযরত আলী (রা.) এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এভাবে, রাসূলে করিম (সা.) এর পর মুসলিম উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রা.) এবং তারপরেই হযরত ওমর (রা.)।

www.pathagar.com

ইসলামের এই চারজন খলিফার ব্যাপারেই তিরমিযী শরীফের একটা হাদীস আছে। হাদীসটি হল, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আবু বকরের উপর আল্লাহ পাকের রহমত নাযেল হোক, তিনি তার মেয়েকে আমার হাতে সমর্পন করেছিলেন। মদীনার দিকে হিজরত করে আমার জন্য তিনি যানবাহনের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'সূর' গুহার নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন, বিলালকে নিজ অর্থে খরিদ করে দিয়েছেন।

ওমরের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত নাযেল হোক, কারো কাছে অপছন্দনীয় এবং কটু মনে হলেও ওমর সব সময় হক কথা বলে থাকে (কারো তিরস্কারের পরোয়া করে না) এই হক কথা বলার কারণে তার কোনো প্রার্থীব বন্ধু নেই।

আল্লাহ পাকের রহমত নাযেল হোক ওসমানের প্রতি, তাঁর লজ্জাশীলতার কারণে আসমানের ফেরেশতাগণও তাঁকে লজ্জা করে।

আল্লাহ পাকের রহমত নাযেল হোক আলীর প্রতি, ইয়া আল্লাহ! আলী যেদিকেই যাক না কেন, আপনি সত্যকে তার সঙ্গী করে রাখুন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর মর্যাদাঃ

এই সাহাবীদের মর্যাদার বর্ণনা দেয়ার কারণ একদিকে যেমন, তাঁরা কতবড় মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) কত প্রিয় ছিলেন, সেটা জানা তেমনি আরেকটি কারণেও বর্ণনা দিতে হবে, সেটা হল, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করারও চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটি নিয়েও হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব প্রচার করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। অথচ রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটি কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি বরং সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল পূর্ব থেকেই। যেমন তাবুকের যুদ্ধের বর্ণনা দেয়ার সময় উল্লেখ করা হয়েছে, এই যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সা.) ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) এর হাতে। সেখানেই ইঙ্গিত ছিল নবীর পরেই খিলাফতের দায়িত্ব নিবেন হযরত আবু বকর (রা.)।

রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশাতেই নামাজের ইমামতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা.) এর হাতে।

রাসূলের (সা.) পরে আবু বকরের (রা.) খেলাফতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মসজিদে নববীর চতুপার্শ্বে যে সব সাহাবীদের বাড়ি ছিল তারা প্রত্যেকেই মসজিদে যাতায়াত সহজ হওয়ার জন্য নিজের নিজের বাড়িতে মসজিদের দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছিল। এই রাস্তা দিয়েই তারা মসজিদে যাতায়াত করতেন। রাসূলের (সা.) ইন্তেকালের আগে তিনি নির্দেশ দিলেন যে সকলেই

www.pathagar.com

নিজের নামে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেল, কেবল আবু বকরের দরজাটি খোলা থাক(বোখারী, মুসলিম শরীফ। উদ্দেশ্য সম্ভবত এটাই ছিল যে, খেলাফতের কাজে বারবার মসজিদে যাতায়াতের জন্য তাঁর দরজাটা উন্মুক্ত থাকা দরকার।

হাদীসে এসেছে, একদিন কোনো এক মহিলা মহানবী (সা.) এর কাছে আসলেন। মহানবী (সা.) ঐ মহিলাকে পরবর্তীতে আরেকবার আসতে বললেন। ঐ মহিলা বললেন, আমি যদি আরেকবার এসে আপনাকে না পাই তাহলে কী করব? (মহিলা মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন) মহানবী (সা.) বললেন, তুমি যদি আমাকে না পাও তাহলে আবু বকরের নিকট যাবে।

বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জমানায় আমরা লোকদের পরস্পরকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আবু বকরকে সবার উপরে প্রাধান্য দিতাম। তারপর ওমর ইবনে খাত্তাবকে। তারপর উসমান ইবনে আফফানকে।

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে একনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকর (রা.)কেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার দ্বীনি ভাই এবং সহচর। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্য আমাদের জন্য যথেষ্ট।

রাসূলের (সা.) প্রতি হযরত আবু বকরের ভালোবাসা, মহব্বত কতটা ছিল তা হিজরতের সময়ের ঘটনা থেকেও আমরা জানতে পারি। রাসূলের (সা.) সাথে হিজরতের এই সফর যে কতবড় বিপদসংকুল ছিল সেটা তিনি জানতেন। তিনি জানতেন যে, যে কোনো সময় জীবন বিপন্ন হতে পারে। অথচ রাসূলের (সা.) সঙ্গী হওয়ায় তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তাঁরা প্রথমে যে গুহায় আশ্রয় নিলেন সেই জনমানব বিবর্জিত শ্বাপদসংকুল পর্বত গুহায় প্রথমে আবু বকর (রা.) নিজে প্রবেশ করে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেন। অসংখ্য ছিদ্রপথ বন্ধ করলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল যখন আবু বকরের হাঁটুর উপর মাথা দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন তখন আরেকটি ছিদ্র দিয়ে একটি বিষধর সাপ হযরত আবু বকর (রা.)কে দংশন করল। যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন কিন্তু রাসূল (সা.)কে তিনি ডাকলেন না। এসময় বিষের যন্ত্রণায় তাঁর চোখের পানি রাসুলের (সা.) গায়ে পড়লে রাসুলুল্লাহ (সা.) জেগে উঠে আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর কাঁদছ কেন? নিজের ঘর, নিজের পরিবার ছেড়ে এসেছ এজন্য? তাদের কথা মনে হচ্ছে? হযরত আবু বকর জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ না, সেজন্য না। আমাকে সাপে দংশন করেছে। কাঁদছি সেই যন্ত্রণায়। আল্লাহর রাসূল (সা.) অবাক হলেন। বললেন, আমাকে জানালে না কেন? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে আপনাকে ডাকিনি। আল্লাহর রাসূল (সা.) তার মুখের থুতু

www.pathagar.com

লাগিয়ে দিলেন, হযরত আবু বকরের (রা.) যন্ত্রণা ভালো হল। প্রিয় পাঠক, কতটা আন্তরিক ভক্তি আর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা থাকলে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় সেটাই এখানে লক্ষণীয় বিষয় যেটা আমাদের পক্ষে হয়তো অনুধাবন করা কঠিন।

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলের (সা.) ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত সবসময় তিনি রাসূলের সঙ্গী ছিলেন। রাসূলের (সা.) সাথে ছায়ার মত ছিলেন। তিনি যে কতবড় নৈতিক বলে বলীয়ান আর সাহসী মানুষ ছিলেন সেটা দেখুন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী ছিলেন। এ ধরণের একজন্য ব্যক্তি অন্য কারো নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন সেটা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার ছিল। তিনি তার রুজী-রোজগারের পথটিকে কঠিন বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েই এগিয়ে এলেন। শুধু তাই না, আল্লাহর রাসূল (সা.) যখনই সাহাবাদের কাছে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই হযরত আবু বকর (রা.) সর্বোচ্চ ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। গত অধ্যায়েই আলোচনাটি এসেছে, তাবুকের যুদ্ধের সময় জাগতিক সব সম্পদ তিনি দান করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) নাম ছাড়া আর কিছুই তার ঘরে ছিল না। একটি বর্ণনা এসেছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) বসেছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করে রাসূলকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) কি ব্যাপার, আবু বকরের শরীরে যে বস্ত্র সেটা কাঁটা দিয়ে আটকানো রয়েছে কেন? আল্লাহর রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, হে জিবরাঈল, আবু বকর তার সকল অর্থ মক্কা বিজয়ের আগে খরচ করে ফেলেছে। এখন তার কাছে এই পরিমাণ অর্থ নেই যা দিয়ে সে একটি বোতাম লাগাতে পারে। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি আবু বকরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌছে দিন এবং তাঁকে বলুন যে, তোমার রব জিজ্ঞাসা করছেন যে, তুমি কি তোমার এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ? না অসন্তষ্ট? নবী করিম (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে আবু বকর, জিবরাঈল (আ.) তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম বলছেন এবং আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করেছেন তুমি কি এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ না অসন্তুষ্ট? হযরত আবু বকর (রা.) এটা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আমি কি আমার রবের উপর অসন্তুষ্ট হব? আমি আমার রবের উপর সন্তুষ্ট আছি। আমি আমার রবের উপর সন্তুষ্ট আছি।

এজন্যই তো হযরত আবু বকরের (রা.) মর্যাদা এত বেশি। এজন্যই তো তিনি জীবিত অবস্থাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, সহীহ হাদীসের বর্ণনা, তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাঁকে কেয়ামতের দিন জান্নাতের সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে। তিনি তাঁর ইচ্ছে মত যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন।

www.pathagar.com

দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত আবু বকর (রা.):

সেই হযরত আবু বকর (রা.) এবার মুসলমানদের খলিফা হলেন বা প্রতিনিধি হলেন বা নেতা হলেন বা রাষ্ট্রনায়ক হলেন। খলিফা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে গিয়ে বসলেন এবং একটি ভাষণ দিলেন। মসজিদের ভিতরে এবং বাইরে হাজার হাজার মুসলমান সমবেত হয়েছিলেন। আনসার এবং মুহাজেরীন উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান সাহাবায়ে কেরামও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "উপস্থিত শ্রোতা ম লী, আমাকে তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে। আমি তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম নই। দায়িত্ব যেহেতু আমার উপর এসেছে তাই আমি যদি ভালো কাজ করি তবে তোমরা সবাই আমাকে সাহায্য করবা আর যদি কোনো খারাপ কাজে হাত দেই, তাহলে তোমরা আমাকে সরল পথে নিয়ে আসবা। মনে রেখ, সততা, সত্যবাদিতা হচ্ছে আমানত। সততা রক্ষা করলেই আমানত রক্ষা করা হয়। আর মিথ্যা ও অন্যায় হল খিয়ানত। ইনশাআল্লাহ, তোমাদের মধ্যে দুর্বল থেকে দুর্বলতম ব্যক্তিও আমার কাছে শক্তিশালী থাকবে যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য অধিকার তাকে ফিরিয়ে দেবো। আর ইনশাআল্লাহ, তোমাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তিও আমার কাছে দুর্বল থাকবে যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে ন্যায্য হক আদায় করব। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। যে জাতির মধ্যে অন্যায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের বিপদাপদ আরো ব্যাপক করে দেন। আমি যে পর্যন্ত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকি সে পর্যন্ত তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আমি যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কারণ তখন আমার আনুগত্য করা তোমাদের উপর ওয়াজিব থাকবে না। এখন নামাজের জন্য দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।"

এখানে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আজকের যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে, আজকের যারা রাষ্ট্রনায়ক, তাদেরকে ইসলামের স্বর্ণযুগের সেই প্রথম খলিফার এই ভাষণ কোনো বার্তা দেয় কিনা, সেটা বোধহয় তাঁরা একটু ভেবে দেখতে পারেন। সেক্ষেত্রে উপকার হবে। তাহলে হঠাৎ করে সিংহাসন থেকে ছিটকে জেলখানায় থাকতে হবে না।

হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বা যুদ্ধঃ

খলিফা হওয়ার পরপরই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সামনে বিপদের পাহাড় দেখতে পান। বহু প্রধান ও প্রভাবশালী গোত্র ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। একদিকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের উত্থান ঘটে। আরেকদিকে

www.pathagar.com

মুরতাদদের দল বিদ্রোহী হয়ে উঠে। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীরা এ সময় বিশৃংখলার চেষ্টা করে। কিন্তু রাসূল (সা.) এর স্থলাভিষিক্ত হযরত আবু বকর (রা.) দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, দূরদৃষ্টি এবং সাহসিকতাপূর্ণ মনোবল নিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে বিপদের মোকাবিলা করেন।

উসামার সেনাবাহিনীঃ

মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে তিনি পাথরের স্তম্ভের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন একটা আশংকাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে, মহানবী (সা.) এর কঠোর পরিশ্রমে ইসলামের যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। সেই সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বিশৃংখলা দমনে অবতীর্ণ হয়ে একজন শক্তিশালী, দূরদর্শী নেতা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) যখন রোগশয্যায়, তখন সাতশত সৈন্যের এক বাহিনীকে উসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে প্রেরণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের দূত হত্যার পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়া। একইসাথে মুতার যুদ্ধে শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণ। আমাদেরকে একটু পেছনের ইতিহাসে যেতে হবে। বিগত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। রাসূলের দূত হত্যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে তিন হাজার সৈন্য মু'তার যুদ্ধে পাঠালেন, সেখানে রোম সম্রাট কায়সার এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু বিজয় অর্জন করেছিল মুসলমানরা। সেখানে কয়েকজন মুসলমানসহ তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হয়েছিলেন। বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা পরাজিত হলেও তাদের দেশ তাদের কাছেই ছিল, তাদের প্রাণও রক্ষা পেয়েছিল। তাই পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই সেখানে জায়েদকে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের খবরে সমগ্র আরবে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এ সময় ঘনিষ্ঠ সাহাবারা নতুন খলিফাকে পরামর্শ দেন এই সংকট মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীকে মদীনার বাইরে কোনো অভিযানে প্রেরণ না করতে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ কিছুতেই পরিবর্তন হবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) উসামা বিন জায়েদকে এই অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন তাই ঐ সেনাপতিকেই বহাল রেখে হযরত আবু বকর (রা.) মুসলিম বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করলেন। হযরত উসামা (রা.) রওনা হলে হযরত আবু বকর (রা.) বহুদূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ঐ মুসলিম বাহিনীকে বিদায় দিলেন। ১১ হিজরীর ১লা রবিউস সানী হযরত উসামা (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেছিলেন এবং বলকা নামক স্থানে পৌছান যেখানে মু'তার যুদ্ধ হয়েছিল। এরপর সিরিয়ার সন্নিকটবর্তী কুদা'আ জনপদটি আক্রমণ করে চল্লিশ দিন পর সফল হয়ে ফিরে

www.pathagar.com

আসেন। অসংখ্য রোমান সৈন্য মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণ গণিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হল। এই আক্রমণ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। এই বিজয় ইসলামের অন্তর্নিহিত নেতিবাচক সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দিহান বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বহু বিদ্রোহী গোত্র কেন্দ্রের সামরিক শক্তির এই প্রদর্শন দেখে পুনরায় নিজেদেরকে ইসলামী আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়। এতে হযরত আবু বকর (রা.) এর দূরদৃষ্টি, সময়োপযোগী ও গতিশীল পদক্ষেপে ইসলামী শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বা জুলকিসসার যুদ্ধঃ

হযরত উসামা (রা.)-এর বাহিনী সিরিয়াতে অবস্থানকালেই উত্তরাঞ্চলের বনু আব্বাস ও বনু যুবিয়ান গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। তারা এই মর্মে মদীনাতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে যে, তাদেরকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। এ সময় যাকাতের ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করার পরামর্শ আশপাশ থেকেও কিছুটা দেয়া হয়েছিল। জবাবে হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "আল্লাহর শপথ! যাকাত হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে যা পাঠানো হতো তার মধ্যে থেকে যদি একটি বকরীর বাচ্চা দিতেও কেউ অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো।" এ ঘোষণা শুনে ঐসব বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো আরো বিদ্রোহ করে বসে। তারা মদীনার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য মদীনা থেকে ১২ মাইল দূরে যুলকিসসা নামক স্থানে সমবেত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনী নিয়ে নিজেই তাদের মোকাবিলায় অগ্রসর হন। এটিই ছিল খলিফায়ে রাসূলের প্রথম যুদ্ধ। তারা পরাজিত হয়। এতে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীরা ভয় পায় এবং নিজের থেকেই যাকাত নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির হয়।

হযরত আবু বকর (রা.) যুলকিসসাতেই ইসলামী বাহিনীকে নতুনভাবে ঢেলে সাজালেন এবং একেক অংশে একেকজন করে নেতা নিয়োগ করলেন। নেতাদের নাম হলঃ (১) খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (২) ইকরিমা (৩) শারাহবীল ইবনে হাসানাহ (৪) মুহাজির ইবনে আবী উমাইয়া (৫) হুযাইফা ইবনে মুহসিন (৬) আরফাজা ইবনে হারসামা (৭) সুওয়াইদ ইবনে মাকরান (৮) আ'লা আল হাদরামী (৯) তরীফা ইবনে হাজেয (১০) আমর ইবনুল আস (১১) খালেদ ইবনে সাঈদ।

ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামঃ

মহানবী (সা.) এর সাফল্য দেখে আরবে নবুওয়াতের কিছু মিথ্যা দাবীদারদের উদ্ভব ঘটে। এই দুর্ভাগারা মনে করেছিল যে, নবুওয়াতের দাবীটি প্রার্থিব উন্নতির একটি

www.pathagar.com

উত্তম উপায় হতে পারে। মহনবী (সা.) এর জীবনের শেষ দিকে ইয়ামানে আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামায় মুসায়লামা কাযযাব নবুওয়াতের দাবী করে বসে। আর মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর নাজদে তুলায়হা আসাদী এবং ইরাকে সাজ্জা নামের এক স্ত্রীলোক নবুওয়াতের দাবী করে। নবুওয়াতের এসব দাবীদারদের সাথে বড় বড় দল ভিড়ে যায় এবং তাদের ফিতনা আরবের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত সাহস ও সংকল্পের সাথে এদিকে মনোযোগ দেন। এসব ভ নবীদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার জন্য ইসলামী বাহিনী প্রেরণ করেন যার মধ্যে মুহাজির এবং আনসাররাও ছিলেন।

তুলায়হা নামক ভ নবীর প্রচারকরা বলে বেড়াতো, তাদের কাছেও ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী আসে। তারা দু'একটা নমুনাও শোনাতো। প্রাচীন আরবদের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় মুর্খতার ও বর্বরতার যুগে যাদুকর ও গণকরা এরকম ছন্দময় বাক্য রচনা করে লোকদেরকে চমৎকৃত করে তুলতো। এজন্য মহানবী (সা.)কেও গণক, জাদুকর বলা হয়েছিল। সর্বপ্রথম হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তুলায়হার দলবলের ওপর আক্রমণ চালালো। সে সময়েও তুলায়হা ধোঁকাবাজীর উদ্দেশ্যে একটি কম্বল মুড়ি দিয়ে ওহীর প্রতীক্ষার ভান করতে লাগলো। কিন্তু তার অনুসারীরাই শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলো সে মিথ্যাবাদী। তারা পালানো শুরু করলো। খালেদ (রা.) তার অনেক অনুসারীদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের নেতা আইনিয়া ইবনে হাসানকে বন্দী করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। সে সময় তুলায়হা সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। পরে আইনিয়া ও তুলাইহা উভয়েই তওবা করে পুনরায় ঈমান আনে।

মুসায়লামা বাহিনীর শক্তি-সামর্থ এবং ঐক্য সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) পূর্ব থেকেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই মুসাইলামার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হলেন। তাই রণকৌশলী, প্রখ্যাত বীর ইকরামা ইবনে আবী জহলকেই মুসাইলামার বিরুদ্ধে পাঠানো যথেষ্ট মনে করলেন না; বরং শেরাহবিল ইবনে হাসানকেও তাঁর সাহাযার্থে পাঠালেন। তারপরেও মুসাইলামার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মুসলমানদের বেগ পেতে হল। কারণ সুযোগ সন্ধানী বহু লোক মুসাইলামার দলে ছিল। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) নির্দেশ দিলেন মুসলিম সেনাপতিদেরকে নিজেদের অবস্থানে থাকতে এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে (রা.) তাদের সাথে মিলিত হওয়ার। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যোগ দেন এবং ব্যাপক যুদ্ধ হয়, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। বিপুল সংখ্যক কুরআনের হাফেজসহ বহু মুসলমান শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই বিজয় অর্জন করেন। মুসাইলামার বাহিনীসহ মিথ্যা নবীর দাবীদার মুসাইলামা নিহত হয় এবং তার দলবল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সাজ্জা মুসায়লামার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। স্বামী নিহত হওয়ায় সে সিরিয়া পালিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর মৃত্যু বরণ করে।

www.pathagar.com

আসওয়াদকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কায়েস ইবনে মাকশূহ ও ফিরোজ দায়লামী হত্যা করে।

মুরতাদদের মূলোৎপাটনঃ

মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর কোনো কোনো আরব গোত্রপতি মুরতাদ হয়ে যায় এবং নিজের নিজের গণ্ডিতে স্বতন্ত্র শাসন কায়েম করে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। এভাবে বাহরাইনে নু'মান ইবনে মুনযির মাথা তুলে দাঁড়ায়। লাকীতে ইবনে মালেক ওমানে বিদ্রোহ করে এবং কিন্দা অঞ্চলেও কিছু শাসকের আবির্ভাব ঘটে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ভ নবীদের শায়েস্তা করার পর এদিকে দৃষ্টি দেন। আলা আল হাদরামীকে বাহরাইনে পাঠান নু'মান ইবনে মুনযিরকে দমন করার জন্য। অনুরূপ হুযায়ফা ইবনে মিহসানের হাতে লাকীত ইবনে মালেকের ধ্বংস সাধন হয় এবং যিয়াদ ইবনে ওয়ালীদের হাতে কিন্দার স্বঘোষিত শাসকদের মূল্যেৎপাটন হয়।

ইরাক সীমান্তে সৈন্য প্রেরণঃ

১২ হিজরীর মুহাররম মাসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। এছাড়া ইরাকে অবস্থানরত বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করেন মুসান্না ইবনে হারেস। ইয়ায ইবনে গনমকেও নির্দেশ দেয়া হয় ঐ এলাকায় বিদ্রোহীদের দমন করার। উদ্দেশ্য ছিল যেন সীমান্ত আক্রমণ থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করা যায় একইসাথে ইসলাম প্রচারেরও কাজ হয়।

সে সময় ইরাক অঞ্চলে বর্গা ভাগে কৃষিকাজ হতো। জমির মনিকরা মুর্খ আরবদেরকে বিভিন্নভাবে ঠকাতো এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করত। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ ধরণের নির্যাতিত লোকের সাথে কোনোপ্রকার খারাপ ব্যবহার না করার জন্য, তাদেরকে বন্দী না করার জন্য। তারা যেন বুঝতে পারে যে, ইসলাম আবির্ভাবের ফলে পূর্বের অত্যাচার, উৎপীড়নের অবসান ঘটেছে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাক সীমান্তে পৌছানোর পর ইসলামী বিধান মোতাবেক সর্বপ্রথম তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু তারা দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কর দিতেও সম্মত হয় না। এ কারণে তাদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধগুলোর নাম হচ্ছেঃ কাযেমিয়ার যুদ্ধ, তানীর যুদ্ধ, ওয়ালজার যুদ্ধ, আলসনের যুদ্ধ, ফোরাতের যুদ্ধ, আম্বারের যুদ্ধ, আইনুত তামারের যুদ্ধ, দুমাতুল জন্দলের যুদ্ধ, যামীলের যুদ্ধ,

www.pathagar.com

ফারাদের যুদ্ধ ইত্যাদি। এসব যুদ্ধে মুসলমানরাই বিজয় লাভ করে এবং বেশ কিছু অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে।

সিরিয়া (শাম) অভিযানঃ

ইসলামী বাহিনী ইরাকে যুদ্ধরত থাকা অবস্থায়ই হযরত আবু বকর (রা.) রোমানদের দিক থেকে বিপদের আশংকা করেছিলেন। তাই তিনি সাহাবীদেরকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন এবং সিদ্ধান্ত হল যে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া যাবে। এসময় হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামী বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)কে একটি অংশের নেতৃত্ব দিয়ে আমেলার পথে ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে নেতৃত্ব দিয়ে হেমসের দিকে পাঠালেন। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে নেতৃত্ব দিয়ে দামেশক পাঠালেন এবং শারাহবীল ইবনে হাসানা (রা.)কে জর্দানের দিকে যাওয়ার আদেশ দিলেন। সিরীয়রা যখন বুঝতে পারলো যে, ইসলামী বাহিনী তাদেরকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে, তখন তারা সেই সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত সম্রাট হিরাক্লিয়াসের (কাইজার) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। হিরাক্লিয়াস তার সমস্ত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমাবেশ করলো। সিরিয়ার একটি বড় উপত্যকা ইয়ারমুকে এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হল। এ যুদ্ধে রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার। হযরত আবু বকর (রা.) পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে সেনাপতিদের বললেন, আমি আরো সৈন্য পাঠাচ্ছি। তিনি ইরাকে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) এর কাছে নির্দেশ পাঠালেন, তুমি মুসান্না ইবনে হারেসের কাছে অর্ধেক সৈন্য রেখে বাকী সৈন্য নিয়ে ইয়ারমুকে যাও এবং গোটা সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করো। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা.) ইয়ারমুখে পৌঁছালেন। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ছত্রিশ হাজার।

এই যুদ্ধ চলাকালীনই ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইন্তেকাল করেন। তবে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং গৌরবজনক বিজয় অর্জন করেন। এই বিজয় মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দেয়।

উপসংহারঃ

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর চরিত্রের মধ্যে একসাথে কঠোর এবং কোমলতার সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি পবিত্র স্বভাব প্রকৃতির ছিলেন। নৈতিক বল আর অসীম সাহস ছিল। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, বিচক্ষণ ছিলেন। মোট কথা, তিনি তাঁর ঈমানী শক্তি এবং সৎ ও দৃঢ় সংকল্প দিয়ে এক বছরের মধ্যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের বিশৃংখলা দমন করেছিলেন, সমস্ত আরব ইসলামী পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

www.pathagar.com

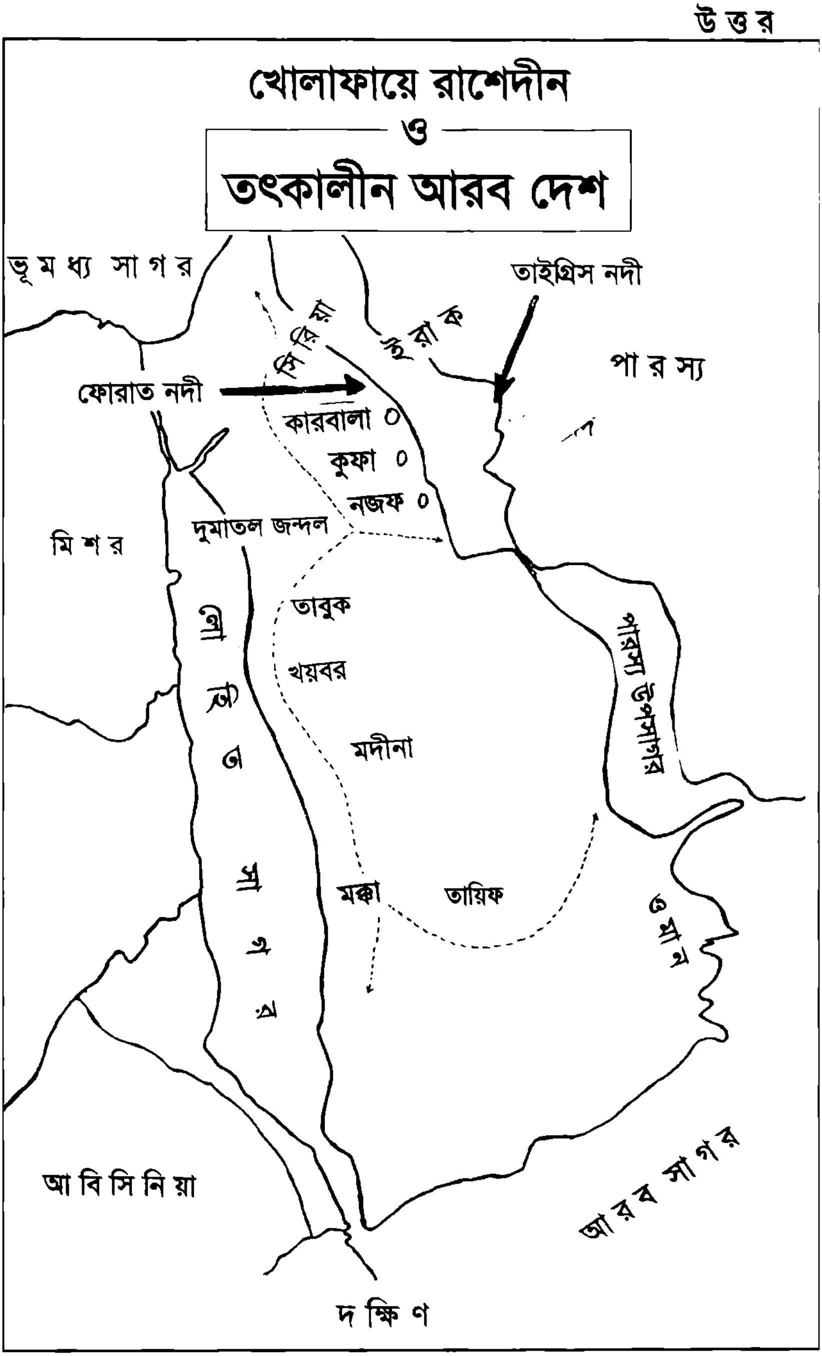

www.pathagar.com

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা
হযরত ওমর ফরুক (রা.) শাসনামলের যুদ্ধ

ভূমিকাঃ

'ব্যটল অব ইসলাম' গ্রন্থে এ পর্যন্ত ৯টি পর্ব আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায়। তাবুকের যুদ্ধের কিছুদিন পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেন। এরপর শুরু হয় খলিফাদের শাসনামল। এর আগের অধ্যায়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর শাসনামলের কিছু খ খ যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবে তার আগে আলোচনা করা হয়েছিল ব্যক্তিগত হযরত আবু বকর (রা.)কে নিয়ে। এ অধ্যায়ের আলোচনা হল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর শাসনামলের যুদ্ধ নিয়ে। একইভাবে এখানেও হযরত ওমর (রা.) এর ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আসবে এবং আসবে একাধিক যুদ্ধের বর্ণনা।

ধারাবাহিকভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রাটি রাসূলের (সা.) যমানায় শেষ হয় তাবুক যুদ্ধে এসে। সে যুদ্ধে মুসলমানরাই বিজয় অর্জন করেছিল। সেই যুদ্ধেই মুসলমানরা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, অচীরেই পৃথিবীতে ইসলামী শক্তি বা মুসলিম শক্তির আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পর সেটা আর ইঙ্গিত দিচ্ছিল না বরং বাস্তবেই মুসলমানরা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি হিসেবে পরিণত হয়ে গেল। মুসলিম রাজ্যের ভৌগলিক সীমারেখা এমনভাবে বিস্তার লাভ করতে শুরু করলো যে, অর্ধেক পৃথিবীর শাসনকর্তা হয়ে গেলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রা.)। আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষের জন্য যে জীবন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়েছিল, তার সার্থক রূপকার হযরত ওমর ফারুক (রা.)। আল্লাহর রাসূল ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে যে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন সেটা ষোলো কলায় পূর্ণ হয় হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর হাতে।

রাসূলের স্বার্থক প্রতিনিধি হযরত ওমর (রা.) জীবনের কঠোরতম সাধনা দিয়ে পৃথিবীর সামনে প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, পৃথিবীর মানুষ যে কোনো স্তরেই থাকুক না কেন দুঃখী, বঞ্চিত, দিশেহারা মানব সমাজের সামনে একমাত্র ইসলামী জীবন-

www.pathagar.com

বিধানই সত্যিকারের শান্তি ও প্রগতি আনতে পারে।

হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাঃ

হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণটি ছিল মহানবী (সা.) এর একটি মু'জিযা। তিরমিযী শরীফের হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল দোয়া করেছিলেন এই বলে যে, 'হে আল্লাহ, তুমি আবু জেহেল ও ওমর এই দুই ব্যক্তির যে কোনো একজনকে দিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও।'

নবীর এই দোয়া হযরত ওমর (রা.) এর অনুকূলে কবুল হয়েছিল। আমরা অনেকেই হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি জানি, তবুও সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করি। আবু জেহেলের উস্কানিতেই হযরত ওমর খোলা তরবারী নিয়ে মহানবী (সা.)কে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় পথে নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ নামে এক সাহাবীর সাথে হযরত ওমরের (রা.) দেখা হল। ওমরের ভাবভঙ্গি দেখে নাঈম এবনে আব্দুল্লাহর সন্দেহ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওমর কোথায় যাচ্ছ? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের নবীকে হত্যা করতে যাচ্ছি। নাঈম বললেন, প্রথমে নিজের ঘর সামলাও। তোমার বোন ফাতেমা এবং ভগ্নিপতি সাইদ বিন যায়েদ দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি রাসূলের কাছে না গিয়ে তার বোনের বাড়িতে গেলেন। তার বোন তখন কুরআন পড়ছিলেন। ওমরকে দেখে তিনি কুরআনের পাতাগুলো লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু ওমরের কানে কিছুটা আওয়াজ গিয়েছিল। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না। সে তার বোনকে এবং ভগ্নিপতিকে মারতে লাগলো, রক্তাক্ত করে ফেললো। এ অবস্থাতেও তার বোন ফাতেমা বলল, তুমি যা খুশী করতে পার কিন্তু আমার অন্তর থেকে ইসলাম দূর হবে না। বোনের এই করুণ অবস্থার মধ্যেও এ ধরণের তেজোদৃপ্ত উক্তি ওমরের অন্তরে দাগ কাটলো। তার মনের মধ্যে চিন্তা হল, কি কারণে এসব মুসলমানরা ইসলামের জন্য এতটা আত্মহারা? এ বিষয়টি তার মনের উপর প্রভাব ফেলল। উপরন্ত তার বোনকে রক্তাক্ত দেখে তার মায়াও লাগলো। তিনি কিছুটা স্নেহ নিয়ে বললেন, কি পড়ছিলে আমাকে শুনাও। ফাতেমা তখন সূরা হাদীদ এর ১-৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়লেন, 'সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিসসামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াহুআল আজিজুল হাকীম থেকে শুরু করে ইনকুনতুম মুমিনীন' এখানে এসে শেষ করলেন। যার বাংলা অর্থ ছিল, (১) 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) নভোম ল ও ভূম লের রাজত্ব তাঁরই। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই নভোম ল ও ভূম ল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি

www.pathagar.com

জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোম ল ও ভূম লের রাজত্ব তারই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (৭) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন?

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতগুলো শোনার পর হযরত ওমরের ভেতরে মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। তার মধ্যে বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। তিনি ছুটে গেলেন রাসূলের (সা.) কাছে। সাহাবীরা ওমরকে এভাবে আসতে দেখে রাসূলের সাথে তাকে দেখা করতে দিতে ইতস্তত করলেন। রাসুলের চাচা হযরত আমির হামযা (রা.) বললেন, তাকে আসতে দাও। যদি ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে তাহলে তার মঙ্গল, অন্যথায় তার তরবারী দিয়েই তাকে জবাব দেয়া হবে। কিন্তু ওমর (রা.) এসেছেন ইসলাম গ্রহণ করতে। মহানবী (সা.) এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর! কি মনে করে আসলে? রাসূলের (সা.) চেহারার দিকে তাকিয়ে আর তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ সম্বোধনে হযরত ওমর আরো অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, এসেছি ইসলাম গ্রহণ করতে এবং সাথে সাথে তিনি কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত ওমর (রা.) যৌবনের শুরুতেই তদানীন্তন অভিজাত আরবদের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো যথা, যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা, বংশতালিকা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় খুব মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং শক্তিমান পুরুষ। মেজাজে ছিল কঠোরতা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কুফরের পক্ষে যেমন কঠোর ছিলেন, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের পক্ষেও তেমনি কঠোর হয়ে পড়লেন। যে কারণে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটতে লাগলো খুব দ্রুত।

হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের সম্প্রসারণ:

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে উপস্থিত সাহাবীরা চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার"। কারণ এই ঘটনাটি ছিল ইসলাম সম্প্রসারণের একটি টার্নিং পয়েন্ট। তখন পর্যন্ত মাত্র ৫০ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে ৩৯

www.pathagar.com

জন পুরুষ আর ১১ জন ছিলেন মহিলা। হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পরেই ইসলাম প্রচারের গতি অনেক তীব্র হয়ে ওঠে এবং ইসলামের শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন থেকে ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছে সেদিন থেকে আমরা সর্বদা সম্মান ও জয়লাভ করে এসেছি।

ইসলাম গ্রহণ করামাত্রই হযরত ওমর (রা.) মহানবী (সা.)সহ পবিত্র কাবা চত্বরে গিয়ে প্রকাশ্যে আযান দিয়ে নামাজ কায়েম করলেন। নামাজ শেষে তরবারী উঁচু করে তিনি ঘোষণা করলেন, আমি ওমর। ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.) এর এক নগন্য খাদেম হওয়ার সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। সুতরাং আজ থেকে কেউ যদি মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের মোকাবিলা করতে চায় তাকে অবশ্যই আগে ওমরের এই তরবারীর মোকাবিলা করতে হবে। এই ঘোষণার পর এতবড় সাহস কারো ছিল না যে, হযরত ওমরের এই কথার জবাব দিবে। অবশ্য এই ঘোষণার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়ে কুরআনের একটি আয়াতও অবতীর্ণ করেন। বলা হল, *"ইয়া~আইয়্যুহান্নাবিয়্যু হাছবুকাল্লাহু ওয়ামানিত্তাবা'আকা মিনাল মু'মিনীন।"* অর্থাৎ হে নবী, আপনার জন্য এবং যে সকল মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (আনফাল-৬৪)

তবে যে ওমর শুরুতে ছিলেন ইসলামের শত্রু, তিনি হয়ে গেলেন ইসলামের রক্ষক। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তিরোধান পর্যন্ত এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যুদ্ধ, চুক্তি, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গ্রহণ করা পন্থা অর্থাৎ এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) জড়িত ছিলেন না। হযরত ওমর (রা.) যে কত সাহসী ছিলেন, মদীনায় হিজরতের সময়ও সেটা বোঝা যায়। মদীনায় হিজরত করার সময়ে কাফেরদের দুর্ব্যবহার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানরা সাধারণত একে একে অনেকেই নিরবে বেরিয়ে পড়ে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাফেরদের সামনে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, আমি মদিনায় চলে যাচ্ছি, কারো যদি হিম্মত থাকে তাহলে উপত্যকার ওপ্রান্তে সে যেন আমার সাথে মোকাবিলা করে। তখনও কারো সাহস হয়নি হযরত ওমর (রা.)কে বাধা দেয়ার। তিনি নিরাপদে মদীনায় উপনীত হন।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর মর্যাদাঃ

** মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার পর আল্লাহ যদি আর কাউকে নবী হিসেবে পাঠাতেন তাহলে সে হতো ওমর ইবনুল খাত্তাব। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

** তিনি আরো বলেন, দুনিয়াতে এমন কোনো শয়তান নেই যে ওমরকে ভয় না করে, আর আকাশে এমন কোনো ফেরেশতা নেই যে ওমরকে সম্মান না করে। (তিরমিযী)

** উপরের এই হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বোখারী শরীফের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করছি। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কক্ষে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মহিলা অর্থাৎ নবী পত্নীরা তাঁর সাথে কথা বলছিলেন এবং তারা নবীর গলার আওয়াজের চেয়ে নিজেদের গলার আওয়াজ উঁচু করে কথা বলছিলেন। ওমরের (রা.) কণ্ঠ শুনেই মহিলারা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন এবং পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসছিলেন। ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সবসময় প্রফুল্ল মনে রাখুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হাসছি ঐসব স্ত্রীলোকদের কথা ভেবে যারা এতক্ষণ আমার কাছে বসা ছিল, তারা যেমনি তোমার গলার আওয়াজ পেল অমনি পর্দার আড়ালে চলে গেল। ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের তো উচিত আপনাকে বেশি ভয় করা। তারপর ওমর (রা.) (ঐসব মহিলাদেরকে লক্ষ করে) বললেন, ওহে দুশমনেরা! তোমরা বুঝি আমাকে ভয় কর আর আল্লাহর রাসূলুল্লাহকে ভয় কর না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ। কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চাইতে অধিকতর রুক্ষ ও কঠোরভাষী। হযরত ওমর (রা.) এ কথায় আরো রেগে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! ওদের কথা ছাড়। ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! চলার পথে শয়তান যখন তোমাকে দেখতে পায় তখন সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে যায়।

** আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিলেন যারা নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে (আল্লাহর তরফ থেকে) কিছু কথা বলা হতো। তাদের মতো এমন কেউ যদি আমার উম্মতের মধ্যে থাকে তবে সে ওমরই বটে! (বোখারী শরীফ)

** আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করেছি। আমি সেখানে একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম--যার আঙ্গিনায় একজন কিশোরী বসে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতারা বললেন, ওমর ইবনে খাত্তাবের। তখন আমার ইচ্ছে হয়েছিল প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখি আল্লাহ তায়ালা ওমরের জন্য কি ব্যবস্থা রেখেছেন। কিন্তু ওমরের আত্মমর্যাদার কথা আমার মনে পড়ে গেল তাই

www.pathagar.com

আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম না। এ কথা শুনে হযরত ওমর কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার কাছেও আত্মসম্মান দেখাতে পারি?

** হযরত ওমর (রা.) এর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) তার জানাজা পড়াতে চাইলে হযরত ওমর আপত্তি করেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) দয়ালু ছিলেন, রাহমাতাল্লিল আলামিন ছিলেন তাই হযরত ওমরের বক্তব্যের সাথে একমত হচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয় এবং মুনাফিকের জানাযা পড়াতে নিষেধ করা হয়।

আরও ২/১টি ছোট ছোট ঘটনাঃ

** প্রকাশ্যে নামাজের জন্য মহানবী (সা.) মদীনায় সাহাবীদের নিয়ে একটা আলোচনা করতে চাইলেন। এ ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করলেন। তখন বিভিন্ন জন বিভিন্নরকম পরামর্শ দিল। সে সময় শঙ্খধ্বনি অথবা ঘণ্টার মাধ্যমে ইহুদীরা তাদের উপাসনালয়ে আহ্বান জানাতো। এর পক্ষেও অনেকে মত দিল। আবার অনেকে এর বিরোধীতা করলো একারণে যে, এটা অন্য ধর্মের অনুকরণ হয়ে যাচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) এসে প্রস্তাব করলেন একজনকে নামাজে আহ্বানের জন্য নিযুক্ত করলে কেমন হয়? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত বেলালকে আজানের নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ নামাজের জন্য আজানের প্রচলনটি হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর মত অনুযায়ী সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়।

**বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব গোত্র থেকেই শত্রুরা এসেছিল, কিন্তু বনী আদী গোত্র অর্থাৎ হযরত ওমরের গোত্র থেকে একটি লোকও যোগদান করেনি। ধারণা করা হয় এটা হয়েছিল হযরত ওমরের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণেই।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণাঢ্য শাসনামলের ২/১টি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাঃ

হযরত ওমর (রা.) যে রাতে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা দেখে বেড়াতেন, সে ঘটনাগুলো আমরা অনেকেই জানি। প্রসঙ্গক্রমেই এখানে ২/১টি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ এই ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে আজকের শাসকদের জন্য কোনো না কোনো বার্তা বহন করে।

** হযরত ওমর (রা.) এর ভৃত্য আসলাম বর্ণনা করছেন, এক রাতে তিনি মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে যেরার নামক একটি স্থানে পৌছিয়ে দেখলেন এক স্ত্রীলোক কি যেন রান্না করছে আর তার চারদিকে দুই-তিনটি ছোট শিশু কাঁদছে।

www.pathagar.com

তিনি কাছে গিয়ে ঐ বাচ্চাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মেয়েটি বলল, কয়েকবেলা তাদেরকে খেতে দিতে পারিনি। তারা কাঁদছে ক্ষুধার জন্য। আমার কাছে কোনো খাবার নেই। এখন ওদেরকে সান্তনা দেয়ার জন্য শুধু হাড়ি চড়িয়ে পানি জ্বাল দিচ্ছি। হযরত ওমর (রা.) এই ঘটনা শোনার সাথে সাথে তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো। তিনি ছুটে এলেন মদিনায়। বায়তুল মাল থেকে কিছু আটা, খেজুর, গোশত ইত্যাদি নিয়ে আসলামকে বললেন, এগুলো আমার পিঠে চাপিয়ে দাও। আসলাম বিনীতভাবে বলল, এগুলো আমাকে দিন, আমি সাথে নিয়ে যাই। জবাবে হযরত ওমর (রা.) বললেন, কিয়ামতের দিন কি তুমি আমার ভার বহন করবে? অবশেষে তিনি নিজে ওগুলো নিয়ে এসে ঐ মহিলাকে দিলেন। এরপর রুটি বানানো হলে ঐ শিশুরা তৃপ্তির সাথে খেয়ে আনন্দে ছুটাছুটি করতে লাগলো। তখন ঐ স্ত্রীলোক বলল, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন, প্রকৃতপক্ষে ওমর নয়, তুমিই আমিরুল মুমিনীন হওয়ার যোগ্য।

** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, এক রাতে হযরত ওমর (রা.) আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, আপনি কেন কষ্ট করলেন, আমাকে ডাকলেই হতো। তিনি বললেন, শুনলাম শহরের বাইরে একটি কাফেলা এসে তাবু ফেলেছে। লোকগুলো খুব ক্লান্ত হয়ে থাকবে। চল আমি আর তুমি আজ রাতে তাদেরকে পাহারা দেই। এরপর আমি হযরত ওমর (রা.) এর সাথে গেলাম এবং সারারাত ঘুরেফিরে পাহারা দিলাম।

** মহাপরামক্রমশালী রোমান সম্রাটের দূত বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনায় আসলেন। তিনি একজন পথিককে জিজ্ঞেস করলেন, খলিফার প্রাসাদ কোথায়? পথিক এই আজব প্রশ্নে বিস্মিত হল। বলল, প্রাসাদ বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন? রাজদূত বলল, ইসলামের খলিফা ওমরের প্রাসাদ। পথিক বলল, আসুন আমার সাথে, আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। দূতকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হল এবং তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন যে, সমজিদের মেঝেতে শুয়ে থাকা একজন লোককে খলিফা ওমর বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রোমান রাজদূত হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। যিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক, যার অজেয় বাহিনী তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ইনিই সেই হযরত ওমর (রা.)! রোমান দূতের মদীনা সফরে এসে ইসলামের এই অজেয় শক্তির কারণ সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না।

** রাষ্ট্রীয় কাজে হযরত ওমর (রা.) যখন জেরুজালেম গেলেন তখন একেবারেই অনাড়ম্বরভাবে গেলেন। শুধু তাই না, রাস্তায় তিনি পালাক্রমে একবার

www.pathagar.com

উটের পিঠে উঠলেন, একবার তাঁর চাকরকে উঠালেন। জেরুজালেম পৌঁছানোর পর যারা তাঁদেরকে স্বাগত জানাতে এসেছিল, তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই উটের পিঠে বসা ব্যক্তিকেই খলিফা মনে করল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা যখন তারা জানতে পারলো তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

দৃষ্টান্তমূলক এধরণের শত শত ঘটনার জন্ম দিয়ে গিয়েছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)।

পরামর্শক্রমে হযরত ওমর (রা.)কে দায়িত্ব প্রদানঃ

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়কাল ছিল সোয়া দুই বছর। তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখনই অনুভব করলেন, খেলাফতের একটা মীমাংসা করা প্রয়োজন। নতুবা তাঁর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। সে সময় হযরত ওমর (রা.) ছিলেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা। হযরত আবু বকর (রা.) এর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই বিশ্বাস ছিল যে, তার পরে এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য ওমর (রা.) একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তারপরেও তিনি সাহাবীদের সাথে আলোচনা করলেন। সাহাবীদের ২/১ জন হযরত ওমর (রা.) এর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন এভাবে—তাঁর যোগ্যতা অপরিসীম, এটা নিয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই তবে তিনি একটু কঠোর প্রকৃতির। তবে হযরত ওসমান (রা.) বলেছিলেন, আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, হযরত ওমরের অন্তর তার বাহ্যিক আচার-আচরণের চাইতে অনেক উর্ধ্বে। আমাদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওসমান (রা.)কে দিয়েই খেলাফতের সনদ লিখালেন এবং অন্য একজনকে দিয়ে জনগণের সামনে পড়ে শুনালেন। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, ভাইসব, আমি আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনকে খলিফা নির্বাচন করিনি; বরং হযরত ওমর (রা.)কে নির্বাচিত করেছি যেন আপনারা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন। উপস্থিত জনগণ বলল, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত ওমর ফারুক (রা.):

হযরত আবু বকর (রা.) এর দাফন কাজ শেষ হওয়ার পরেই হযরত ওমর (রা.) উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে একটি ছোট্ট ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, মুসলিম জনতা! আল্লাহ তোমাদেরকে ও আমাকে একসাথে শামিল করে দিয়েছেন। আর আমার প্রাক্তন দুই সঙ্গীর পর আমাকে জিন্দাহ ও অবশিষ্ট রেখেছেন। আল্লাহর শপথ! আমার সামনে যে সকল ব্যাপার উপস্থাপিত হবে, তা সবই আমি মীমাংসা

www.pathagar.com

করব। বস্তুত, লোকেরা যদি আমার প্রতি ইহ্‌সান ও কল্যাণের আচরণ গ্রহণ করে, আমিও তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহারই করব। কিন্তু যদি কেউ খারাপ ও অবাঞ্ছনীয় আরচণ অবলম্বন করে, তাহলে আমিও তাদেরকে কঠোর শাস্তি দান করব।

তাঁর এই ভাষণটি মূলত নীতি নির্ধারণী ভাষণ ছিল। তিনি তাঁর এই কথা অনুযায়ী কাজ করে গিয়েছেন। একটা বিষয় উল্লেখ করে নেয়া ভালো, হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিল সম্পূর্ণরূপে শরীয়াতের ব্যাপারে--আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে তিনি কোনোদিনই এক বিন্দু কঠোরতা প্রদর্শন করেননি। নিজের এক ভাষণে তিনি প্রসঙ্গতই বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমার দিল্ আল্লাহর ব্যাপারে যখন নরম হয়, তখন পানির ফেনা অপেক্ষাও বেশি নরম ও কোমল হয়ে যায়। আর আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়াতের ব্যাপারে (প্রয়োজন মোতাবেক) যখন শক্ত ও কঠোর হয়, তখন তা পাথর অপেক্ষা বেশি শক্ত ও দুর্ভেদ্য হয়ে পড়ে।

খিলাফতের ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, খিলাফতের কাজ যথাযথরূপে সম্পন্ন হতে পারে না যতক্ষণ না এমন কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, যা জুলুমের পর্যায়ে গিয়ে না পৌঁছায়। এমন বিষয়েও নম্রতা অবলম্বিত হওয়া উচিত নয়, যার ভিত্তি দুর্বলতার উপর স্থাপিত।

অর্থাৎ তার চরিত্রে কঠোরতা আর কোমলতার সংমিশ্রণ ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি কঠোর অথবা কোমল হতেন। তিনি যদি কোমল না হতেন তাহলে নিজের পিঠে আটার বোঝা উঠিয়ে নিতেন না।

ওমর ফারুক (রা.) এর জবাবদিহিতা:

তিনি জনগণের সামনে একবার বললেন, হে জনগণ, আমি যদি নবীর (সা.) সুন্নত এবং আবু বকর (রা.) এর কর্মপন্থার পরিপন্থী কোনো আদেশ দেই তাহলে তোমরা কি করবে? কেউ জবাব দিল না। তিনি পুনরায় এই প্রশ্ন করলেন। এক যুবক তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তরবারীর সাহায্যে আপনাকে সঠিক পথে আনবো। এ জবাব শুনে ওমর ফারুক (রা.) খুশী হলেন।

অন্য একদিন হযরত ওমর (রা.) মসজিদের মধ্যে খুৎবা দিতে দাঁড়ালে এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল, হে আমিরুল মোমিনিন, খুৎবা থামান। আগে বলুন, আপনার গায়ে লম্বা জামা কেন? বায়তুল মাল থেকে আমরাতো এক খ করে কাপড় পেয়েছি। ঐ কাপড়ে এতবড় জামা তো হওয়ার কথা না। মসজিদের সকল মুসলমান ঐ যুবকের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। হযরত ওমর (রা.) এর ছেলে দাঁড়িয়ে বলল,

www.pathagar.com

উত্তরটা আমি দেই। বায়তুল মাল থেকে এক খ করে কাপড় সবার জন্য বরাদ্দ ছিল। আমিও এক খ পেয়েছি। আমিরুল মোমিনিনও এক খ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর লম্বা-চওড়া শরীরে এক খ কাপড় কম পড়ে বিধায় আমারটা আমার বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। দুই কাপড় একত্র করে বানানো হয়েছে বিধায় জামাটি লম্বা হয়েছে। ঐ যুবক বলল, হে আমিরুল মোমিনিন, আমি উত্তরে সন্তুষ্ট। আপনি নামাজ পড়ান। অর্থাৎ তিনি এমন জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী ছিলেন যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

হযরত ওমর (রা.) এর বিজয়সমূহ:

খেলাফতের ভার গ্রহণ করার পর হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর সর্বপ্রথম দায়িত্ব ছিল হযরত আবু বকর (রা.) এর অভিযানগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করা। তিনি সেটা করলেন। তিনি খলিফা নির্বাচিত হবার পর যুদ্ধ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

সিরিয়া:

সিরিয়ায় যখন ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন। হযরত ওমর (রা.) দায়িত্ব গ্রহণ করে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে হযরত আবু উবায়দাকে (রা.) সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। শুরুতেই তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়ে যাত্রা শুরু করেন তা লক্ষ্যনীয়। খালিদ (রা.)কে উপাধী দেয়া হয়েছিল 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারী, যিনি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী সৈনিক, তাকেই হযরত ওমর (রা.) পদচ্যুত করলেন। তবে এর পেছনে ব্যক্তিগত কোনো ক্রোধ কাজ করেনি। এজন্য খালিদ বিন ওয়ালীদও (রা.) এ ঘটনায় প্রভাবিত হননি। তিনি এটি সাথে সাথে মেনেও নিয়েছেন। তাঁর উপরে যে দায়িত্ব ছিল সেটা তিনি পালন করে গিয়েছেন। কারণ তাঁরা সকলেই ইসলামের জন্য কাজ করতেন, আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতেন।

ইয়ারমুকের ময়দানে রোমানরা মারাত্মক পরাজয় বরণ করে। এরপর খলিফার পক্ষ থেকে দামেশক আক্রমণ চালানোর নির্দেশ আসে। কারণ সেটাও ছিল সিরিয়ারই অংশ। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর গোটা বাহিনীকে অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে দামেশকের উপর আক্রমণ চালান এবং শহর অবরোধ করেন। ১৭ দিন পর্যন্ত এটি অবরোধ থাকে। শেষ পর্যন্ত খালিদ (রা.) সুকৌশলে তা দখল করে নেন এবং হরযত ওমর (রা.)কে বিজয়ের খবর দেন। এরপর **ফাহল, মুরজ, রোম, হিমৃস, কানসারীন, হালব (আলেপ্পো) এবং ইনতাকিয়ার** যুদ্ধসমূহ

www.pathagar.com

সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধেও মুসলমানরা বিজয় লাভ করেন এবং সব এলাকাগুলোই মুসলমানদের অধিকারে আসে।

এসব বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা (রা.) বিজিত এলাকায় কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং সাথে সাথে মায়সারা ইবনে মাসরুক এবং মালেক ইবনে হারেসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী এশিয়া মাইনরের দিকে পাঠান। সেখানে রোমান ও খৃষ্টান আরবদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধেও মুসলামনরা বিজয় লাভ করে। খালেদ (রা.) এর নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল মারআশ অভিমুখে যাত্রা করে এবং সে এলাকাও বিজিত হয়।

মুরজে রূম ও বায়সান বেদখল হওয়ার পর কাইজার আরতাবুন নামক এক চালাক ও ধুরন্ধর সেনাপতিকে সিরিয়ার অবশিষ্ট এলাকা রক্ষার জন্য এক বিশাল বাহিনীসহ পাঠান। আরতাবুন কিছু সৈন্য রামলায় এবং কিছু সৈন্য বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষার জন্য রেখে আজনাদাইন নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। হযরত ওমর (রা.) বিষয়টি অবহিত হয়ে আমর ইবনুল আস (রা.)কে সেনাবাহিনীসহ আজনাদাইনের দিকে এবং আলকামা ইবনে হাকীম ফারাসী ও মাসরূক মক্কীকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং আবু আইয়ুব মালেকীকে রামলার দিকে পাঠান।

আজনাদাইনে প্রচ যুদ্ধ হয় এবং আরতাবুন পরাজিত হয়। মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস (রা.) আজনাদাইন বিজয়ের পর গাজা, সাতিয়া, নাবলুস, লুদ, আমওয়াস, বৈরুত, হিবরুন ও ইয়াফা দখল করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে তিনি পৌছে সৈন্যদেরকে চারদিকে ছড়িয়ে দেন। ঠিক এই সময়েই আবু উবায়দা (রা.) এবং খালিদও (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে উপস্থিত হন।

ইসলামের রীতি অনুসারে আবু উবায়দা (রা.) কুদসের অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম বাহিনী কুদস অবরোধ করে ফেলে। অবরোধের প্রচ তায় বাধ্য হয়ে কুদসের অধিবাসীরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়। তারা শর্ত দেয় যে, আমিরুল মুমিনীনকে এসে নিজ হাতে সন্ধিপত্র লিখতে হবে। বিষয়টি হযরত ওমর (রা.) অবহিত হলে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে আলোচনা করে হযরত আলীকে (রা.) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে ১৬ হিরজীতে বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রা করেন।

একদম অনাড়ম্বরপূর্ণভাবে মদীনা থেকে যাত্রা করে তিনি সেখানে পৌছান। এই যাত্রাটি কতটা অনাড়ম্বরপূর্ণ ছিল, এবং ইতিহাসে ঘটনাবহুল ছিল সেটা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার সহকারীকে উটের পিঠে বসিয়ে তিনি উটের রশি ধরে গন্তব্যে পৌছালেন। দীর্ঘ সময় তিনি সেখানে থাকলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্ধি

www.pathagar.com

চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করলেন। এরপর তিনি মূল শহরেও গিয়েছিলেন এবং মসজিদে আকসায় গিয়ে দু'রাকায়াত তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করেন। তিনি সাখরার পাশে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। এ মসজিদটিই বর্তমানে মসজিদে উমর নামে পরিচিত। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ফেরার সময় তিনি গোটা দেশ সফর করেন। সে সময় সীমান্তসমূহ পরিদর্শন করে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন এবং মদীনায় ফিরে আসেন।

১৬ হিজরিতে রামলা বিজিত হয়। এ সময় হযরত ওমর (রা.) ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসকে একাংশের রাজধানী করে আলকামা ইবনে মুখবারেযকে সেখানকার গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং অপর অংশের রাজধানী করেন রামলাকে এবং সেখানকার গভর্ণর নিয়োগ করেন আলকামা ইবনে হাকীমকে।

১৭ হিজরীতে রোমানরা হিমসের ওপর প্রচ হামলা করে ব্যর্থ হয়। এরপর মুসলিম বাহিনী **জাযিয়া (ফোরাত ও দজলা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) তাকরীব, মুসেল, রিক্কা, নাসীবাইন, হাররান, সামিয়াত, কারাকসা, সুরুজ, জাসরে আসাদ** এবং অন্যান্য এলাকার বিরুদ্ধে সামান্য যুদ্ধের পরেই তা দখল করে নেন। এরপর আরো অগ্রসর হয়ে পশ্চিম সিরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং পূর্বে আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হন। **দারব** এবং **বালীস** এলাকা দখল করেন এবং সাফল্যের ঝা া উড়িয়ে **খালাত** ও **আইনে হামেদা** পর্যন্ত গিয়ে থামেন। এভাবে গোটা সিরিয়া মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

মিসর (আফ্রিকা):

মিসর রাজনৈতিকভাবে রোমের বাদশাহ কাইজারের শাসনাধীন ছিল। সেখানকার শাসক ছিলেন মুকাওকিস। তিনি ছিলেন কিবতীদের ধর্মীয় ও প্রার্থিব নেতা। জাহেলী যুগে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মিসর ভ্রমণ করেছিলেন। তাই মিসরে ইসলাম ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি হযরত ওমর (রা.) এর কাছে অনুমতি চাইলে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে মিসর অভিযানের অনুমতি দিলেন। আমর ইবনুল আস (রা.) প্রাথমিকভাবে চার হাজার সৈন্য নিয়ে মিসর আক্রমণ করেন। সেখানে **ফারমা, বালীলিস, উম্মে ওয়ানীন** প্রভৃতি দখল করে ফুসতাতের নিকটবর্তী দুর্গ অবরোধ করেন এবং হযরত ওমর (রা.)কে আরো সামরিক সাহায্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। হযরত ওমর (রা.) যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.), উবাদা ইবনে সামেত (রা.), মিকদাদ ইবনে ওমর এবং সালামা ইবনে মাখলাদ (রা.) এই চারজন অফিসারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেন। সাত মাস অবরোধের পর যুবায়ের (রা.) এর অসাধারণ বীরত্বের ফলে ১৯ হিজরীতে দুর্গটি মুসলমানদের

www.pathagar.com

দখলে আসে। ইসলামী বাহিনী সেখান থেকে ২০ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিবতী ও রোমান সৈন্যদের সাথে মারাত্মক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত হয় এবং **আলেকজান্দ্রিয়া** অধিকারে আসে। এই আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারে আসার সাথে সাথেই সমস্ত মিশরের উপর ইসলামের প্রভাব পড়ে এবং বহু সংখ্যক কিবতী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। অবশিষ্ট অধিবাসীরা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়।

২২ হিজরীতে আমর ইবনুল আস (রা.) বারকার দিকে অগ্রসর হলে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর তিনি পশ্চিমে তারাবেলসের দিকে অগ্রসর হন। এক সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর সেটাও অধিকারে চলে আসে।

ইরাক-ইরানঃ

ইরাক-ইরান বিজয় বা পারস্য বিজয় ছিল প্রকৃতপক্ষে সবথেকে বড় বিজয়। কারণ পারস্যদেরকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে ধরা হতো। তারাও সেটাই মনে করতো। তারা অহংকারী ছিল, শক্তিশালী ছিল। সেখানে পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে বহু জমিদার ছিল। তারা নিজ নিজ জমিদারী রক্ষার জন্য শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পদে পদে মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। এই পারস্য বা ইরান বিজয় করতে গিয়েই ইরানীদের সাথে মুসলমানদের প্রায় আশিটি যুদ্ধ হয়। প্রায় ত্রিশ হাজার ইরানী নিহত হয় এবং আট হাজার মুসলমান শহীদ হন।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন খলিফা তখন ইরাক অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করলে হযরত ওমর ফারুক (রা.) খলিফা হলেন। ইরাকের ব্যাপারে সাধারণভাবে মনে করা হতো যে, ইরাক পারস্য সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে বিজয় অর্জন করা অসম্ভব ব্যাপার। হযরত ওমর (রা.) খলিফা হওয়ার পর এসময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক বাইয়াতের জন্য আসছিলেন। তিনি কয়েকদিন জেহাদের জন্য বক্তৃতা করে মুসলমানদেরকে ইরানীদের বিরুদ্ধে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইরান বিজয় সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যৎবাণী মনে করিয়ে দেন। তাঁর এ আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া দেন আবু উবায়েদ সাকাফী (রা.)। অতঃপর এক বিশাল জনতা ইরানের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সুতরাং আবু উবায়েদ (রা.) এর নেতৃত্বে একটি নতুন বাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনীতে বহু সংখ্যক সাহাবীও অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত সালীত (রা.)ও এ বাহিনীতে ছিলেন। মুসান্না (রা.) অনতিবিলম্বে ইরাক যাওয়ার নির্দেশ পেলেন। পরপরই আবু উবায়েদের (রা.) বাহিনীও রওনা হলো। দুইজন সেনাধ্যক্ষই নিজ নিজ বাহিনী সাথে নিয়ে নামারেকে গিয়ে একত্রিত হলেন। ইরানীরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ইরানী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রুস্তম

www.pathagar.com

জাবানকে মোকাবিলার জন্য পাঠায়। প্রচ যুদ্ধ হয়। জাবান পরাজিত হয়। মুসলমানদের হাতে প্রচুর গণিমতের মাল আসে। এরইমধ্যে ইরানের বাদশাহর খালাতো ভাই নারসী শাহ মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু সেও পরাজয় বরণ করে। এরপর জালবুসের নেতৃত্বে আরও একটি বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। মুসলিম বাহিনী তাদেরকেও পরাজিত করে। এ তিনটি যুদ্ধ শেষে গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বন্দীদেরসহ রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অবশিষ্ট সম্পদ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টণ করে দেয়া হয়।

একের পর এক এসব পরাজয়ের খবর ইরান সম্রাজ্ঞী পুরানদাখতের কাছে পৌছালে তিনি বাহমান জাদুকে ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং তিন হাজার হাতীসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঠান। ফোরাত নদীর তীরে উভয় বাহিনী সমবেত হলে সাহস নিয়ে আবু উবায়েদ (রা.) নদী পার হয়ে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধে মুসলমানরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৯ হাজার মুসলিম সৈনিকের মধ্যে ৬ হাজার সৈনিক শাহাদাত লাভ করেন। শত্রুপক্ষেরও অনেক ক্ষতি হয়। মদীনায় হযরত ওমর (রা.) কাছে এই সংবাদ গেলে তিনি মুসান্না (রা.) এর অধীনে কাজ করার জন্য চার হাজার সৈন্য দিয়ে হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালীকে ইরাকে প্রেরণ করে। এ সময় ইরানী বাহিনীর সেনাপতি ছিল মাহরান বিন মাহরাবিয়া। পুনরায় উভয় বাহিনী তাইগ্রীস নদীর তীরে সমবেত হয়ে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এ সময় শত্রু বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলমান বাহিনীর দশ গুণ। কিন্তু মুসলমানরাই সেখানে বিজয় লাভ করে। মাহরান নিহত হয়। এ যুদ্ধ ইয়াওমূল আশার নামে পরিচিত।

১৫ হিজরীর সূচনাতে যে ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় তা কাদেসিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইরানীদের সাথে যতগুলো যুদ্ধ হয় তার মধ্যে কাদেসিয়ার যুদ্ধটি অত্যন্ত ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী বিজয়ের খবর মাদায়েনে পৌছলে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মেয়ের পরিবর্তে কোনো পুরুষকে সিংহাসনে বসাতে হবে। তারা অভ্যন্তরীণ বিভেদ মিটিয়ে সম্রাজ্ঞী পুরানদাখতকে অপসারণ করে ইরানী রাজকুমার ইয়াযদগির্দকে সিংহাসনে বসায়। এই রাজকুমার ইয়াযদগির্দ ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী এবং সাহসী যুবক। তিনি ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। সেনাবাহিনীতে নতুন লোক ভর্তির জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করেন। এ সময় ইরানের বহু বিজিত এলাকা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। রুস্তম নিজে দুই লাখ লড়াকু সৈন্য এবং বিপুল সংখ্যক হাতি নিয়ে সাবাত নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। হযরত ওমর (রা.)কে এ খবর জাননো হলে তিনি মুসলিম বাহিনীকে ইরাকের সব এলাকা থেকে আরব সীমান্তে এসে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি সকল গভর্ণরের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, যেখানেই

www.pathagar.com

যুদ্ধক্ষম যুবক, সুদক্ষ সৈনিক এবং অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার আছে তারা যেন অবিলম্বে রাজধানীতে পৌঁছে যায়। সে সময় মদীনাতে মানুষ দলে দলে পৌঁছাতে শুরু করে। এই যুদ্ধে আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সাহাবী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)কে সেনাধ্যক্ষ করা হয়।

হযরত সা'দ রওনা হয়ে কাদেসিয়া পৌঁছলেন। সেনাবাহিনীকে সাজানোর ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) এর নির্দেশকে অনুসরণ করেন। এ যুদ্ধে হযরত সাদ (রা.) এর বাহিনীর সর্বমোট সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। তাদের মধ্যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৯৯ জন সাহাবীসহ মোট এক হাজার সাহাবী (রা.) ছিলেন। এ যুদ্ধের জন্য হযরত ওমর অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তিনি বিজয়ের জন্য দোয়া করেন।

ইসলামী জিহাদের নিয়ম অনুযায়ী হযরত সাদ (রা.) বিশিষ্ট নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল ইয়াযদিগির্দের কাছে পাঠালেন। প্রতিনিধি দল নির্ভিক হয়ে কিন্তু অত্যন্ত সৌজন্যতাবোধের সাথে তাদেরকে তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণের আহ্বান জানালেন। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান অথবা তরবারীর সাহায্যে যুদ্ধ। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে খুব অযৌক্তিক জবাব দেয়া হয়। বলা হয় রীতিনীতির পরিপন্থী না হলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। এও বলা হয় যে, আমি রুস্তমকে লিখছি, সে তোমাদেরকে এবং তোমাদের সঙ্গীদেরকে কাদেসিয়ার গর্তের মধ্যে দাফন করবে। মোট কথা প্রতিনিধি দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। এরপরে রুস্তম কাদেসিয়ায় এলে আরেকবার আলোচনার চেষ্টা চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনা সফল না হলে রুস্তম ঘোষণা দেয়, সূর্যের শপথ আমি এখন সব আরবকে ধ্বংস করে ফেলব। এ সময় কয়েকদিন ব্যাপী ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে অনেক বড় বড় ইরানী নেতা নিহত হয়। দুর্দান্ত লড়াই করেও রুস্তম পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে পালাতে শুরু করে। কিন্তু মুসলমান সৈনিকের তরবারির আঘাতে সে মারা যায়। এই ভয়াবহ যুদ্ধে আট হাজার মুসলমান শহীদ হন। প্রায় ত্রিশ হাজার ইরানী নিহত হয়। জয়লাভ করে মুসলমানরা। হযরত সাদ (রা.) এই বিজয়ের সুসংবাদ হযরত ওমর (রা.) এর কাছে লিখে পাঠান এবং জানতে চান যে, কাদেসিয়ায় মুসলিম বাহিনী আপনার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। হযরত ওমর (রা.) নির্দেশ দেন মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

মাদায়েন ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত শহর। সেখানে দরবার, মহল ও রাজপ্রাসাদ ছিল। ১৬ হিজরীতে মুসলমানরা পূর্ণ তিন মাস অবরোধ করে রাখার পর সেটা দখল করে নেয়। ইসলামী বাহিনী মাদায়েনে প্রবেশ করে মহলে ইসলামী পতাকা উঠিয়ে দেয়। হযরত সা'দ (রা.) ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) মুসলিম বাহিনীর সাথে শাহী দরবার মহলে নামায আদায় করেন। ইয়াযদর্গিদ পরিবারসহ হুলওয়ানে পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

অন্যান্য ইরানীরা মাদায়েন থেকে পালিয়ে **জালুলাতে** সামরিক হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে। হাশেম ইবনে আনসারির নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটি দল জালুলার দিকে অগ্রসর হয় এবং কিছু সময় অবরুদ্ধ রাখার পর তা দখল করে নেয়। এখান থেকে মুসলিম বাহিনী হুলওয়ানের দিকে রওনা হয়। সেখানকার শাসক খসরুকে পরাজিত করে মুসলমানরা **হুলওয়ান** দখল করে। ইয়াযদর্গিদ এখান থেকেও পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইরাকের ভূমিতে এটাই মুসলমানদের শেষ বিজয় কারণ ইরাকের সীমান্ত এখানেই শেষ।

১৭ এবং ১৮ হিজরীতে **আহওয়ায, মুস, মুসেল, তাকরীত, মাসবাযান, কারকিয়া, জাযিরা, আর্মেনিয়া** এগুলো মুসলমানগণ দখল করেন।

১৮ হিজরীর পর হযরত ওমর (রা.) ইরানের সমস্ত শহরের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেগুলো দখল করার জন্য হযরত সা'দকে (রা.) নির্দেশ দেন। ফলে ১৯ এবং ২০ হিজরীতে **খুরাসান, আরদশীর, সাবুর, ইসতাখার, সার্দালিসিয়া, দারা হাজুদ, কিরমান, সিজিস্তান, তসতর, হামাদান, মাকরান, দাহনুয, সিরাজ, সাহবান, কাজবীন, তাবারিস্তান, কাওসারাহ, জুরজান, তাখারিস্তান, ফারগানা, সাগাদ, বলখ, দায়লাম** অঞ্চলগুলো মুসলমানদের আয়ত্তে আসে।

মার্কে অবস্থানরত ইয়াযদর্গিদ যখন দেখলো যে, ইসলামী বাহিনী গোট দেশ দখল করে ফেলেছে তখন ২১ হিজরীতে সেখান থেকেই আরেকবার মুসলমানদেরকে মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। এসময় মারওয়ান শাহর নেতৃত্বে দেড় লক্ষ ইরানী সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হল। নু'মান বিন মাকরান ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে এগিয়ে যান। সেখানেও প্রচ যুদ্ধ হয়। নু'মান শাহাদাত বরণ করেন। তার ভাই নাঈম পতাকা হাতে নেন। যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু রাত ঘনিয়ে আসলে ইরানীরা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা এই যুদ্ধকে ফাতহুল ফুতুহ অর্থাৎ অন্যতম বিজয় বলে আখ্যায়িত করে।

২১ হিজরীতে সমস্ত ইরান ইসলামী কর্তৃত্বে চলে আসে। হযরত ওমর (রা.) ইরান বিজয়ের সুসংবাদ পেয়ে মুসলমানদের একত্রিত করেন এবং বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়ে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার শেষে বললেন, আজ অগ্নিপূজকদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন আর তারা কোনোভাবেই মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরাও যদি সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাদের থেকেও কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দেবেন।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। এসব যুদ্ধে হযরত ওমর (রা.) সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি, সেটা সাহাবীদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষেই, সবার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব অভিযান হযরত ওমর (রা.) এর নির্দেশনা

www.pathagar.com

সাপেক্ষেই বাস্তবায়িত হয়েছে। সবকিছুই তিনি অবগত থেকে নির্দেশ দিয়ে করিয়েছেন।

সাফল্যের কারণঃ

মহানবী (সা.) এর আদর্শে মুসলিম জাতির মধ্যে অটল বিশ্বাস এবং হযরত ওমর (রা.) এর যোগ্য নেতৃত্বে মুসলমানদের আত্মচেতনা এমন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর সাথে সাথে এমন কিছু কারণ দেখা দিয়েছিল যা শুধু যুদ্ধ জয়ে নয়, যুদ্ধোত্তরকালে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল মুসলমানদের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা। এর ফলে যে সমস্ত দেশ মুসলমানদের দখলে আসতো, সেখানকার অধিবাসীদের সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়ে পড়তো যে, কোনো অবস্থাতেই তারা মুসলমানদের পতন কামনা করত না।

ক্রমাগত পরাজয়ের খবরে হিরাক্লিয়াস তখন কনস্টান্টিনোপল চলে গিয়েছিলেন। সেখানে মুসলমানদের হাত থেকে পালিয়ে আসা এক রোমানের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। হিরাক্লিয়াস তার কাছে মুসলমানদের অবস্থা জানতে চান। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করেন, মুসলমানদেরতো সৈন্য সংখ্যা খুব বেশি না, অস্ত্রের সংখ্যা খুব বেশি না, তারপরেও তারা বিজয় অর্জন করছে কিভাবে? উত্তরে ঐ রোমান বলেন, হে বাদশাহ, তারা দিনের বেলা দুর্ধর্ষ সৈনিক আর রাতে খোদাভীরু দরবেশ। বাদশাহর পুত্র চুরি করলেও তারা হাত কেটে ফেলে। ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলম্বন তাদের স্থায়ী নীতি। তারা তাদের হাতে পরাজিত লোকদের মালও মূল্য পরিশোধ না করে গ্রহণ করে না। তারা যে দেশেই প্রবেশ করে সে দেশেই নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু যে জাতিই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সেই জাতি অস্ত্র ত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা তাদেরকে ছাড়ে না। হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের এই পরিচয় জানার পর অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) এর শাসনামলে গৃহীত কিছু ব্যবস্থাঃ

** হযরত ওমর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থাটা ছিল এমনই যে, বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা ও জাঁকজমক কোনো কিছু বরদাশত করা হতো না। তিনি শাসক ও শাসিতের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও সমতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। বিলাসিতা এবং উচ্ছৃংখলতা যেন তাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে সে জন্য তিনি সব সময়

www.pathagar.com

সজাগ থাকতেন। নবনিযুক্ত শাসনকর্তা বা গভর্ণরদের কাছ থেকে তিনি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন যে, তারা মিহি বস্ত্র পরিধান করবে না, ঘরের দরজা বন্ধ করবে না বা কারারক্ষী নিযুক্ত করবে না, যাতে যখনই কেউ তোমার কাছে আসতে চাই সে যেন বিনা বাধায় আসতে পারে। রুগ্নদের দেখাশোনা করতে যাবে এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করবে। কেউ এর বিরুদ্ধে গেলে তিনি তাকে পদচ্যুত করতেন।

একবার গভর্ণরদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, মনে রেখো, আমি তোমাদেরকে একনায়ক ও জালেম বানিয়ে পাঠাইনি বরং ইমাম বানিয়ে পাঠিয়েছি যাতে মানুষ তোমাদের কাছে পথের সন্ধান পায়। তোমরা মুসলমানদের হক আদায় করবে। তোমরা তাদের প্রহার করবে না কিংবা অযথা প্রশংসা করবে না। তাদের জন্য দরজা বন্ধ করবে না, তাহলে শক্তিমানরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করবে। কোনো বিষয়ে তাদের চেয়ে নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দেবে না। এটা হবে তাদের প্রতি জুলুম।

কুফা নগরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হযরত সায়াদ কুফা নগরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) নির্দেশ দিয়ে সেটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মিশরে হযরত খারেজা বিন হাজাফা এক বালাখানা তৈরি করার সংবাদ পেয়ে হযরত ওমর (রা.) সেটাকে ধ্বংস করার নির্দেশ পাঠালেন। হজ্বের সময় মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে হযরত ওমর (রা.) সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা। এছাড়া জনগণের প্রতি তাঁর সাধারণ নির্দেশ ছিল, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে নির্ভয়ে তাঁকে জানাতে হবে।

এখানে প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। হযরত ওমর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থাটাই ছিল জনগণের কল্যাণের জন্য। সেখানে শাস্তি পেতে হত তাদের জনপ্রতিনিধিকে, দায়িত্ব পালন না করার জন্য। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা ঠিক এর উল্টো। এখানে সবচেয়ে কষ্টের মুখোমুখিই হয় জনগণ। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমেই। সেটা ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিনিধি হোক, উপজেলার হোক, সিটি কর্পোরেশনের হোক আর সংসদের হোক। এখানে প্রতিনিধিকে কোনো জবাব দিতে হয় না, কোনো শাস্তি পেতে হয় না। তবে আমাদের উচিত মাঝে মধ্যে হলেও কয়েকশ বছর পেছনের ঐ সমস্ত শাসন ব্যবস্থার দিকে একটু লক্ষ্য করা, সেখান থেকে কিছু শিক্ষা নেয়া। মনে রাখা দরকার, ক্ষমতা সারাজীবনের জন্য নয়। ক্ষমতা দিয়েও আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করেন।

www.pathagar.com

** বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁর মত দৃষ্টান্ত আর কেউ দেখাতে পারেনি। পক্ষপাতহীন এমন বিচার ব্যবস্থা সবার জন্য একটা প্রতীক।

** তিনি বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর আগে গণিমতের মাল বা বাইরের থেকে কোনো সম্পদ এলে সেগুলো বিলি করে দেয়া হতো। তিনি বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছিলেন।

** তিনি ফৌজদারী পুলিশ বিভাগ, জেলখানা উদ্ভাবন, নির্বাসন ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

** তিনি মানুষের নৈতিক উন্নতির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন।

** তিনি কর্মচারীদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় যে কোনো কর্মচারী নিয়োগকালে তার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করে খলিফার দফতরে সংরক্ষণ করা হতো। এরপর ঐ কর্মচারীর সম্পত্তিতে অস্বাভাবিক উন্নতি দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। একবার এরকমই কিছু ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেটা বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন।

** তিনি তদন্ত বিভাগ, তদন্ত কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

** কর্মচারীদেরকে দুর্নীতিমুক্ত ও কর্তব্যপরায়ন রাখার জন্য তাদের যথেষ্ট পরিমাণ বেতন নির্ধারণ করেন। যাতে অর্থ উপার্জনের জন্য দ্বিতীয় কোনো পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হতো না।

** বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়াটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে হযরত ওমর (রা.) এর এক অভিনব কীর্তি।

তিনি যা কিছু করতেন, আল্লাহকে ভয় করেই করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, যদি এমন ঘোষণা আসে যে, একজন ছাড়া পৃথিবীর সব মানুষ জান্নাতি হবে তখনও আমার মন এই আতংকে থাকবে যে না জানি সেই হতভাগ্য আমিই হয়ে পড়ি কিনা। খলিফা হবার পর নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। এ জন্যই তাঁর খেলাফতের সময়টি এত সুন্দর, এত নন্দিত।

প্রিয় পাঠক, হযরত ওমর (রা.) এর সময় ইসলামের যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছিল, তিনি যে সব নিয়মে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, সফলতা পেয়েছিলেন, সেটার বর্ণনা অনেক বড়। এ গ্রন্থে অত বড় বর্ণনায় যাওয়া সম্ভব হবে না। হযরত ওমরের (রা.) খিলাফতকালে ইসলামের অপূর্ব বিজয় সাধিত হয়। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, আর্মেনিয়া, ইরান, ফিলিস্তিন, আজারবাইজান, আলজেরিয়া, ত্রিপোলী ইত্যাদিতে

www.pathagar.com

ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। বস্তুত এর আগে এভাবে দেশ জয়ের কোনো দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়নি। এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, সেকেন্দর কিংবা চেঙ্গিজদের দিগ্বিজয়ের কথাও আমরা জানি। আমরা হয়তো সে জন্য বলতে পারি যে, হযরত ওমরের (রা.) মত দিগ্বিজয়ী আরো জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মগ্রহণ করেছেন সত্য। তবে পার্থক্যটা হলো, তারা রাজ্য জয় করতে যেয়ে অত্যাচার, লুণ্ঠন, বিভীষিকা এবং গণহত্যার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) এর বিজয় ইতিহাসের কোথাও ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের গণ্ডি থেকে এক তিল পরিমাণও বিচ্যুতি হয়নি। বরং তিনি যেখানে জয় করেছেন সেখানেই শান্তি-শৃংখলা ফিরে এসেছে।

উপসংহারঃ

আজকে আমাদের মাঝে রাসুল (সা.) এর সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। সাহাবীদের শাসনামলও নেই। আমাদের সামনে এখন আছে শুধু কুরআন, আছে হাদীস এবং ইতিহাস। আমরা রাসূলের (সা.) যুগ আর ফিরে পাবো না। খলিফাদের যুগও ফিরে পাবো না। তবে কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করলে আমরাও সুন্দর রাষ্ট্র পেতে পারি সেই প্রতিশ্রুতি আছে। সেই প্রতিশ্রুতির শর্ত পূরণ করে আমরাও আজ একটি সুন্দর রাষ্ট্র গড়তে পারি কিনা সেটা ভেবে দেখার অবকাশ আছে বৈকি!

www.pathagar.com

কারবালার যুদ্ধ বা ঘটনা

ভূমিকাঃ

এ অধ্যায়ে আলোচনা হবে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের, যার নাম কারবালার যুদ্ধ। আমরা যখন স্কুলে পড়ি, তখন পাঠ্যসূচীতে একটি কবিতা ছিল। খুব বিখ্যাত, খুব পরিচিত কবিতা। হয়তো এখনো কোনো ক্লাসের পাঠ্যসূচীতে থাকতে পারে। আমি সেই কবিতার কিছু অংশ এখানে সংযুক্ত করছি। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'মহররম' নামেই এই কবিতাটি।

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
"আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা
"আম্মা গো পানি দাও ফেটে গেল ছাতিমা!"
নিয়ে তৃষা শাহারার দুনিয়ার হাহাকার
কারবালা প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার!
পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাধনে

তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল
"দাদা! তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়মাল!
হায়দারী হাঁক হাঁকি দুলদুল আসওয়ার
শমশের চমকায় দুষমনে ত্রাসবার
খসে পড়ে হাত হতে শত্রুর তরবার
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লাহর দরবার
নিঃশেষ দুষমন; ও কে রণ শ্রান্ত
ফোরাতের নীরে নেমে মুছে আঁখি প্রান্ত?
কোথা বাবা আসগর? শোকে বুক ঝাঁঝরা

www.pathagar.com

পানি দেখে হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা
ধুকে মলো আহা তবু পানি এক কাতরা
দেয়নিরে বাছাদের মুখে কমজাতরা!
অঞ্জলী হতে পানি পড়ে গেল ঝর্ ঝর্
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর জর্জর!
হলকুমে হানে তেগ ও কে বুসে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধারিয়া রাতিতে!
আসমান ভরে গেল গোধুলিতে দুপুরে
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে
ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহিনা।

এই লেখার যে অর্থটি, যে চিত্রটি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে সেটি কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনায় যেতে হবে।

যা ঘটেছিল:

চাঁদের যে মাস, সেখানে বছরের প্রথম মাসের নাম মহররম। এই মাসের ১০ তারিখেই মহানবী (সা.) এর দৌহিত্র, হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। যেটি ছিল নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক, হত্যাকা । মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পর আরো অনেক মর্মান্তিক হত্যাকা ঘটেছে। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা.) এর এই ঘটনা মুসলমানদের জন্য যতটা শোক, যতটা আহাজারী বয়ে এনেছে তা আর অন্য কোনো ঘটনায় এমনটি হয়নি। যেখানে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) স্ব-পরিবারে ইয়াযীদের সৈন্যের হাতে শহীদ হন। স্থানটি ছিল কারবালা। হিজরী ৬১ সালের ১০ মহররম কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত এই ঘটনাটি এখন থেকে সাড়ে তেরশো বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আজও সেই শোক দুনিয়াব্যাপী চলছে। এখানে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেটি ছিল একটি অসম যুদ্ধ। ইয়াযীদের এক বিশাল বাহিনীর সাথে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর একটি ক্ষুদ্র দল বা পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের যুদ্ধ। এই অসম যুদ্ধটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকার যুদ্ধ, অন্যায়ের সাথে আপোষ না করার যুদ্ধ। এখানে ইমাম হুসাইন (রা.) জুলুমবাজ শাসকের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেই এই অবস্থা এড়াতে পারতেন। কিন্তু অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ঐতিহাসিক এ দিনটি ছিল মহররম মাসের ১০ তারিখ। এই তারিখটি একাধিক

www.pathagar.com

কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন কারণে দিনটি গুরুত্বপূর্ণ, আমরা সে আলোচনায় যাবো না। আমরা যে আলোচনাগুলো করব সেগুলো হল, কেন এই কারবালার ঘটনাটি আমাদের হৃদয়কে এত স্পর্শ করে? আমরা কেন এত ব্যথিত হই? এই কারবালার তাৎপর্য কী? এই কারবালা থেকে আমরা কী শিক্ষা গ্রহণ করি ইত্যাদি বিষয়।

ইমাম হুসাইন (রা.) এর পরিচয়:

কারবালার যুদ্ধে যিনি নিষ্ঠুর পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে শাহাদত বরণ করলেন তিনি ছিলেন সাইয়্যেদুল আম্বিয়া, সর্দারে দোআলম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় নাতি হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)। যার বাবা-মা ছিলেন আমিরুল মুমেনিন, শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) ও খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা.)। ইমাম হুসাইন (রা.) ৪র্থ হিজরীর ৫ শাবান মোতাবেক ৬২৬ খৃষ্টাব্দের ৫ জুন জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই তার নাম রাখেন হুসাইন। হাদীস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে এবং তাঁর ভাই হাসান (রা)কে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। রাসূল (সা.) তাঁর নাতিকে কতটা ভালোবাসতেন সেটা দেখা যায় একজন সাহাবীর বর্ণনা থেকে। ঐ সাহাবী বলেন, একবার রাসূল (সা.) মাগরিব অথবা এশার নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে এলেন। তখন তাঁর কোলে ইমাম হাসান অথবা হুসাইন ছিল। নামায পড়ানোর সময় হলে তাকে কোল থেকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে রাখলেন এবং নামায শুরু করলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন। অনেক সময় কেটে গেলে আমি মাথা উঁচু করে দেখি, শিশুটি তাঁর পিঠের ওপর চড়ে বসে আছে। এটা দেখে আমি পুনরায় সিজদায় চলে গেলাম। নামায শেষে লোকেরা রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলো, হে রাসূল (সা.) আপনি একটা সিজদা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে করেছেন। আমরা ভেবেছি, আপনি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, অথবা এই সময় আপনার কাছে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল (সা.) বললেন, এ দুটোর কোনোটিই হয়নি। আমার নাতি আমার পিঠে চড়াও হয়ে বসেছিল। ওকে নামিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়নি।

একবার রাসূল (সা.) হযরত ফাতেমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে ভেতর থেকে হযরত হুসাইন (রা.) এর কান্নার শব্দ শুনলেন। তিনি তখন বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন এবং মেয়েকে বললেন, তুমি জাননা, ওদের কান্না শুনলে আমার কষ্ট হয়।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসামা ইবনে যায়দ বর্ণনা করেন, আমি কোনো এক প্রয়োজনে রাতের বেলা রাসূল (সা.) এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি

www.pathagar.com

চাদরের ভেতরে কি যেন আবৃত করে বাইরে এলেন। আমি কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল আপনি চাদরে কী লুকিয়ে রেখেছেন? তিনি চাদর সরালেন। দেখা গেল ভেতরে শিশু হাসান ও হুসাইন (রা.) রয়েছে। তিনি বললেন, এরা দুজন আমার মেয়ের ছেলে। হে আল্লাহ, আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি। তুমিও এদের উভয়কে এবং এদের উভয়কে যারা ভালোবাসে, তাদেরকে ভালোবাসো।

উপরের এই দু'একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় হযরত হুসাইন (রা.) কত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন রাসূল (সা.) এর কাছে। আর রাসূলের (সা.) কাছে যিনি প্রিয় ব্যক্তি, তার উপরে কোনো বিপদ এলে যে কোনো মুসলমানের মনে যে কষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক।

কারবালা ঘটনার প্রেক্ষাপট:

ব্যাটল অব ইসলাম গ্রন্থে কারবালার ঘটনাবলীর আলোচনা আসবে ইতিহাসের বইপত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই। এ আলোচনা করতে গেলে একটু পেছনের ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে, ৮২ বছর বয়সে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা.) বিদ্রোহী আততায়ীগণের হাতে শহীদ হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব প্রথমে বিনীতভাবে অস্বীকার করেন। কিন্তু সাহাবীদের অনুরোধে পরে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাঁর এই দায়িত্ব গ্রহণ স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেননি। যেমন মিশরের তৎকালীন শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন সবুর, সিরিয়ার শাসনকর্তা ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) এর মন্ত্রণাসচিব হযরত মু'আবিয়ার দূরের চাচাত ভাই মারওয়ান বিন হাকাম। এখানে একটু বলে নেয়া ভলো, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) এর সময় নিয়োগপ্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু হযরত আলী ছিলেন ইসলামের জন্য নিঃস্বার্থ একজন ব্যক্তি, নিবেদিতপ্রাণ একজন ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি যা কিছু করেছেন, সেটা ইসলামের জন্য করেছেন। খয়বরের যুদ্ধের একটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করতে পারি। এক ইহুদী সৈন্যকে পরাজিত করে তিনি যখন তরবারী নিয়ে তার বুকের উপর চড়াও হলেন, তখন ঐ ইহুদী তার জীবন সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা হিসেবে হযরত আলী (রা.) এর মুখে থু থু দিল। হযরত আলী সাথে সাথে তার বুকের উপর থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমাকে এখন আর হত্যা করব না। ঐ ইহুদী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, কারণ কী? হযরত আলী বললেন, কারণ তুমি থু থু দেয়ার ফলে তোমার উপর আমার ব্যক্তিগতভাবে রাগ হচ্ছে। এর আগে তোমার সাথে আমার শত্রুতা ছিল আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের জন্য।

www.pathagar.com

এখন ওটা হয়ে গেছে ব্যক্তিগত আক্রোশ। ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে কাউকে হত্যা করা মুসলমানদের জন্য সঙ্গত নয়। এই ছিলেন হযরত আলী (রা.)। তিনি ছিলেন সবসময় আরাম আয়েশ থেকে দূরে। বিলাসিতার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ শাসক ছিলেন। হক ও ইনসাফের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে তাঁর দরবারে এসে সুবিচার না নিয়ে ফিরে যেতে হতো না। কারো সাধ্য ছিল না তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোনো দুর্নীতি করে। তাঁর এই কঠোর নীতি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। তাঁর সহোদর ভাই আকীল বায়তুল মাল থেকে নিজের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিতে অনুরোধ করলে হযরত আলী (রা.) তা দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন। এরপর আকীল সহোদর আলী (রা.)কে ত্যাগ করে মু'আবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। মু'আবিয়ার কাছ থেকে প্রচুর পরিমান অর্থ সাহায্য পান। এজন্য একটু আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিগুলো হযরত আলী (রা.) এর বিপক্ষে চলে যান।

হযরত আলী (রা.) ৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ জুন তথা ৩৫তম হিজরি বছরের জিলহজ্জ মাসের ২৫ তারিখে মদিনার মসজিদে উপস্থিত মুসলমানগণের আনুগত্য গ্রহণ করত ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাস পর প্রথম বড় যেই বিদ্রোহ বা যুদ্ধ খলিফা আলী (রা.)কে মোকাবিলা করতে হয় সেটা ছিল জমলের যুদ্ধ বা উটের যুদ্ধ (৩৬ হিজরী)। এরপর চ্যালডিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। হযরত আলী (রা.) আবার সেই বিদ্রোহগুলো দমন করতে ছুটে গেলেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করে তিনি রাজধানী পবিত্র মদিনায় ফেরত আসতে না আসতেই ইসলামী রাজ্যের আরেক প্রান্ত হতে বিদ্রোহের দাবালন জ্বলে উঠলো। এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মু'য়াবিয়া (রা.)। সমস্ত আরবে এভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে কিনা এই আশংকায় হযরত আলী (রা.) তাড়াতাড়ি করে ইরাক প্রদেশের মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত কুফা শহরে তার রাজধানী স্থানান্তর করলেন। সেখান থেকে আল মাদাইনে গমন করেন। রাক্কা নামক স্থানে ফোরাত নদী পার হন এবং ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে 'সিফ্ফিন' নামক প্রান্তরে মু'য়াবিয়ার নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনীর মোকাবিলায় লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে উমাইয়া বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শাসনকর্তাগণ মু'আবিয়া (রা.) এর পক্ষ নেন এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শাসনকর্তা হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ নেন। হিজরী ৩৬তম বছরের জিলহজ্ব মাস থেকে নিয়ে পরবর্তী ৩ মাসে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক পর্যায়ে একটি সন্ধি হয় মু'আবিয়ার পক্ষের সঙ্গে। সেখানে মু'আবিয়ার পক্ষে কিছুটা চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয় বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। ৬৬১ খৃষ্টাব্দ তথা ৪০তম হিজরি বছরের ১৭ রমজান তারিখে কুফাতে হযরত আলী (রা.) আততায়ীর আক্রমণে শাহাদত বরণ

www.pathagar.com

করেন। কুফা শহরের পাশ দিয়ে ফোরাত নদী বহমান ছিল। ঐ নদীর প্লাবন থেকে কুফা শহরকে বাঁচানোর জন্য একটি শহর রক্ষা বাধ নির্মাণ করা হয়েছিল। ঐ বাধের পাশেই হযরত আলী (রা.)কে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ঐ স্থানে 'নাজাফ' শহর প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত হল কুফা, নাজাফ ও কারবালা। স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার সুবাদে আমাদের প্রায় সবার কাছেই কুফা, নাজাফ, বাগদাদ, কারবালা ইত্যাদি নামগুলো পরিচিত। ৪/৫ বছর পূর্বের হিসাব অনুযায়ী বাগদাদ থেকে গাড়িতে কুফা যেতে দুই আড়াই ঘণ্টা সময় লাগতো। আবার কুফা থেকে গাড়িতে করে নাজাফ যেতে পাঁচ-ছয় মিনিট লাগে এবং নাজাফ থেকে কারবালা যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। বর্তমান কারবালা শহরেই ইমাম হুসাইন (রা.) এর পবিত্র মাজার অবস্থিত।

হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণের পর তার বড় ছেলে ৩৬ বছরে বয়সে, হযরত হাসান (রা.) ৪০ হিজরিতে ইরাক প্রদেশে খলিফা নির্বাচিত হন এবং সেখান থেকেই হিজায এবং খোড়াসান প্রদেশও শাসন করতেন। তার শাসনকালের ৪ মাসের মাথায় তৎকালীন অপর শাসনকর্তা মু'আবিয়া (রা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপক্রম হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির অন্যতম শর্ত মোতাবেক হযরত হাসান (রা.) খেলাফত ত্যাগ করেন তথা ক্ষমতা পরিত্যাগ করে মদিনায় চলে যান। সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল যে, মু'আবিয়া (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত হাসান (রা.) এর ছোট ভাই ইমাম হুসাইন (রা.) খলিফা নির্বাচিত হবেন।

হযরত আলী (রা.) যেমন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তেমনি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য ইমাম হাসানও (রা.) খেলাফত ত্যাগ করেন। কিন্তু সন্ধির শর্তও উপেক্ষিত হয়। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মু'আবিয়ার মৃত্যু হলে তার পুত্র ইয়াযীদ ক্ষমতা গ্রহণ করে। এর ফলে তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতে, উম্মাহর ধর্মীয় নেতা ও ইসলামী রাজ্যের শাসনকর্তা তথা খলিফা হওয়ার কোনোপ্রকার চারিত্রিক, নৈতিক, শিক্ষাগত যোগ্যতাই ইয়াযীদের মধ্যে ছিল না। এ কারণে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর ইরাকী সমর্থকরা ইয়াযীদ কর্তৃক বেআইনী ও অনিয়মিত বা প্রথাবহির্ভূত পদ্ধতিতে সিংহাসনে আরোহণ করায় ইয়াযীদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ইয়াযীদ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব ও সিংহাসন দখল করে। এ সময় কুফাবাসীদের উপর্যুপরি নিমন্ত্রণ ও আনুগত্যের আশ্বাসে, ইমাম হুসাইন (রা.) মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। তখন সাময়িকভাবে ইমাম হুসাইন (রা.) পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় কোনো কর্মপন্থা সুনিশ্চিতভাবে অবলম্বন করার আগে ইমাম হুসাইন (রা.) তার একজন জ্ঞাতি ভাই

www.pathagar.com

মুসলিম ইবনে আকিলকে পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য ইরাকের কুফা নগরীতে প্রেরণ করেন। সেখানে হাজার হাজার (শিয়া) মুসলমান মুসলিম ইবনে আকিলকে সাক্ষী রেখে ইমাম হুসাইন (রা.) এর প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করে। সেই হাজার হাজার মুসলমানের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাতি ভাই মুসলিম ইবনে আকিল ইমাম হুসাইনকে (রা.) পত্র লেখেন যে, তিনি যেন মক্কা ত্যাগ করে ইরাক চলে আসেন।

ইতোমধ্যে ইয়াযীদের খৃষ্টান উপদেষ্টার পরামর্শ মোতাবেক ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কুফার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল। ওবায়দুল্লাহ তৎক্ষনিকভাবে মুসলিম ইবনে আকিলকে বন্দি করে হত্যা করে। যেটি ইমাম হুসাইন (রা.) জানতে পারলেন না। তিনি কুফা শহরের উদ্দেশ্যে ৩ জিলহজ্জ ৬০ হিজরি তারিখে মক্কা ত্যাগ করে রওনা হয়ে পড়েছিলেন। কারণ উমাইয়া স্বেচ্ছাচারী শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যারা ইমাম হুসাইন (রা.) এর কাছে সাহায্য চাইলো, তাদেরকে সাহায্য করা তিনি কর্তব্য বলে মনে করলেন। তাঁর দলটি ছিল অতি ক্ষুদ্র তথা পরিবার পরিজন ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ের একটি দল। ইমাম হুসাইন (রা.) এর বোন বিবি জয়নাব (রা.) ও তাঁর দুই কিশোর পুত্র, ইমাম হুসাইন (রা.) এর চাচাতো ভাই হযরত আব্বাস আলমদার (রা.), হুসাইন (রা.) এর বড় ভাই ইমাম হাসান (রা.) এর পুত্র কাসিম (রা.) ও কাসিম (রা.) এর নব পরিনিতা স্ত্রী, হুসাইন (রা.) এর মেয়ে সাকিনা (রা.), কাসিম (রা.) এর ছোট ভাই আব্দুল্লাহ (রা.), নিজের বড় ছেলে আলী আকবর (রা.), ছোট ছেলে আওসাদ, যয়নুল আবেদীন, শিশু পুত্র আলী আসগর এবং পুত্রগণের মাতা শাহারবান (রা.) ... এধরণের সকলেই এই দলে ছিলেন। পথেই ইমাম হুসাইন (রা.) এর দল ওবায়দুল্লাহর অশ্বারোহী বাহিনীর নজরদারিতে পড়েন। এ অশ্বারোহী বাহিনী ইমাম হুসাইন (রা.) এর দলকে যাত্রা বন্ধ করতে আহ্বান জানায় এবং ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার দাবী করে। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা.) এই দাবী মানতে অস্বীকার করেন। কারণ এই দাবী মেনে নেয়ার অর্থই ছিল অন্যায় ও অসত্যের সাথে আপোষ করা তথা নতি স্বীকার করা। শেষ পর্যন্ত ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রা.) এর দল অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এই ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তর ছিল ধু-ধু মরুভূমি। এখানে শত্রু পক্ষ ইমাম হুসাইন (রা.)এর দলকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করার জন্য ফোরাত নদীর পানি ব্যবহার করার সব পথ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী কয়েকটি দিন ইমাম হুসাইন (রা.) এর দল পিপাসা নিবারণের জন্য কোনো পানি পান নি। ১০ই মহররমের বিকাল বেলা শাহাদতের পূর্ব সময় পর্যন্ত ইমাম হুসাইন (রা.) নিজেও পানি না খেয়ে ছিলেন। এখানে উল্লেখ করতে হবে, শত্রুরা ইমাম হুসাইন (রা.) এর তরবারীর সামনে আসতে সাহস করলো না। এসেছিল একদম শেষে। এর আগে একটা দল যুদ্ধ না করে ফিরেই গিয়েছিল।

www.pathagar.com

কারণ ইমাম হাসান এবং হুসাইন (রা.) ছিলেন একদিকে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নাতি, অন্যদিকে সেই বীর, সেই বাহিনীর সদস্য, যাঁরা মিশর দখল করার পর আফ্রিকার অন্যান্য এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে সর্ব পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। এছাড়া হযরম উসমান (রা.) এর আমলে যখন বিদ্রোহ হল, তাঁকে হত্যার জন্য তার বাসভবন ঘিরে ফেলা হল, তখন যে কয়জন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করেছিলেন তার মধ্যেই ছিলেন ইমাম হুসাইনও (রা.)। তাই দুর্বৃত্তরা এই অল্প সংখ্যক বীরের দলের সরাসরি সামনে এলো না। সামনে না এসে তাঁদেরকে অশেষ দুর্ভোগ দেয়ার জন্য পানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

অবরুদ্ধ অবস্থায় ইমাম হুসাইন (রা.) এর দল কুফা থেকে সাহায্যকারী বা সমমনা দল আশা করেছিলেন। কিন্তু কুফা থেকে অনুগত মুসলমান বাহিনীও বিভিন্ন কারণে তথা কুফাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইমাম হুসাইনকে (রা.) সাহায্য করার জন্য কারবালার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতেই ১০ মহররম ৬১ হিজরী তথা ১০ অক্টোবর ৬৮০ খৃষ্টাব্দ সকালে জনৈক উমার ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ৪০০০ উমাইয়া সৈন্যের সেনাপতি হিসেবে ইমাম হুসাইন (রা.) এর দলের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দ ায়মান হয়। আত্মসমর্পনে আবারো অস্বীকৃতি জানানোর পর উমাইয়া বাহিনী ইমাম হুসাইন (রা.) এর ক্ষুদ্র দলকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইমাম হুসাইন (রা.) গুরুতর আহত হন। কিছু সময়ের মধ্যে সীমার নামক এক পাষ ইমাম হুসাইন (রা.) এর মাথা কেটে ফেলে। তিনি শাহাদত বরণ করেন এবং ইতিহাসের এই দুঃজনক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আঠারো জনসহ মোট বাহাত্তর জনের সকলেই শাহাদত বরণ করেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন তার অসুস্থ ছেলে জয়নুল আবেদিন। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইমাম হুসাইন (রা.) পক্ষের প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তি অসম্ভব সাহস দেখিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর কাটা মাথাটি গভর্ণর উবায়দুল্লাহর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে মুচকি মুচকি হাসছিল এবং একটা ছড়ি দিয়ে ঐ কাটা মাথাটি খোঁচাচ্ছিল। ওখানে ছিলেন এক অতি বৃদ্ধ সাহাবী। তিনি এই দৃশ্য দেখে চুপ থাকতে পারেননি। তিনি গভর্ণরকে বলেছেন, তোমার ছড়িটা সরাও। আল্লাহর কসম, আমি স্বচক্ষে বহুবার রাসূল (সা.)কে ঐ চেহারার উপর চুমু খেতে দেখেছি। এই যুদ্ধের বিবরণ পড়ে এবং অবরোধকারী বাহিনী কর্তৃক ইমাম হুসাইন (রা.) এর পরিবারের উপর অমানবিক, অশোভন আচরণের বিবরণ পড়ে নবী প্রেমিক কোনো ব্যক্তির পক্ষেই স্থির থাকা সম্ভব না।

তবে ইতিহাস স্বাক্ষী দেয়, যারা এই হত্যাকা ঘটিয়েছিল, ইমাম হুসাইন (রা.) এর ঘাতকরা কেউ নির্মম প্রতিশোধ থেকে রক্ষা পায়নি। দুনিয়াতেই এ শাস্তি শুরু

www.pathagar.com

হয়েছিল। কেউ এমন কষ্টদায়ক অবস্থার শিকার হয়েছে যে, এর চাইতে মৃত্যুও ভালো ছিল। কেউ নিহত হয়েছে, কেউ অন্ধ হয়ে গিয়েছে, কেউ পাগল হয়ে গিয়েছে। দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র ইয়াযীদের শাসনামল ছিল মাত্র তিন বছর। তারপরেই গণবিদ্রোহ হয়। পরবর্তীতে মুসলমান শাসকগণ ইমাম হুসাইন (রা.) হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদেরকে হত্যা করেন। শিমারকে কলঙ্কজনকভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয়।

কারবালার তাৎপর্য বা মূল্যায়নঃ

কারবালার ঘটনা ইতিহাসে এক শোচনীয় মর্মান্তিক ঘটনা। ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুচরদের প্রতি উমাইয়া সরকার যে নৃশংস ব্যবহার করেছিল তার সংবাদ দাবানলের মত মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়ে। হজ্জ উপলক্ষে মক্কা ও মদীনায় সমাগত নর-নারীদের মধ্যে নবীর পরিবারের বিধবা স্ত্রী ও এতিম শিশু সন্তানদেরকে দেখে তাঁদের মনের মধ্যে যে সহানুভূতি ও অনুকম্পা সৃষ্টি হল তাতেই সমগ্র মুসলিম জগত উমাইয়া সরকারের প্রতি আক্রোশে ফেটে পড়ল। ইমাম হুসাইন (রা.) ন্যায় ও সত্যের প্রতীক এবং ইয়াযীদ অন্যায় অসত্যের প্রতীক বলে পৃথিবীব্যাপী বিবেচিত হল।

ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাদের ঘটনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইতিবাচক যে দিকটির কথা বলতে হবে সেটি হল, এই বেদনার পাশাপাশি এটি একটি মহিমান্বিত ইতিহাসও। কারণ সত্য ও ন্যায়, সাম্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরাচারি ইয়াযীদের বিরুদ্ধে সেদিন ইমাম হুসাইন (রা.) যেভাবে বীর বিক্রমে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই ত্যাগ চিরকাল এ জাতীয় সংকট ও সমস্যা উত্তরণের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে। এ ঘটনার পরেই ইয়াযীদের ভীত নড়ে ওঠে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মুসলিম জাতি পুনরুজ্জীবিত হয়। মুসলমানরা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। এই ঘটনা মুসলিম জাতিকে তাদের ভেতরের শত্রু কারা সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে সাহায্য করে। কারণ পরবর্তীতেও ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা যখনই শত্রু আর মিত্র চিনতে ভুল করেছে, তখনই তারা বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। কারবালার ঘটনাটির বড় প্রভাব হল, খেলাফতের পর গত সাড়ে তেরশ বছরে মুসলিম জাতির ভেতর ইসলাম রক্ষার যে চেতনা ও শৌর্যবীর্য আপন মহিমায় ভাস্বর রয়েছে, তার পেছনে কুরআন ও সুন্নাহর পরে ইসলামের ইতিহাসের যে ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি উপাদান হিসেবে সক্রিয় রয়েছে, কারবালার ঘটনা তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে যে সব যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো ছিল মুসলিম বাহিনীর সাথে অমুসলিম বাহিনীর। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম ছিল। এখানে যুদ্ধ হয়েছিল হক এবং

www.pathagar.com

বাতিলের মধ্যে। মুসলমান নামধারী মুনাফেক, স্বার্থপর, ভোগবিলাসী এবং রাজতন্ত্র অনুরাগী শাসকদের সাথে। এখানে শাসকরা বিজয়ী হয়েছিল কিন্তু নন্দিত হতে পারেনি। অন্যায় করে বিজয় অর্জন করলেও যে নন্দিত হওয়া যায় না, ধিকৃত হতে হয়, কারবালার ঘটনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

শুরুতেই বলেছিলাম এই যুদ্ধটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকার যুদ্ধ, অন্যায়ের সাথে আপোষ না করার যুদ্ধ, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা গণতন্ত্র বহির্ভুত কোনো পন্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা, সম্মান ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে খিলাফাতে রাশেদার আমলের ইনসাফ, ন্যায়নীতি, মানবিক সাম্য, চারিত্রিক সততা ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের সুমহান মূলনীতির কাছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের এই সুমহান মূলনীতিগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) ইয়াযীদের দুঃশাসন ও কুশাসনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা যোগায়।

www.pathagar.com

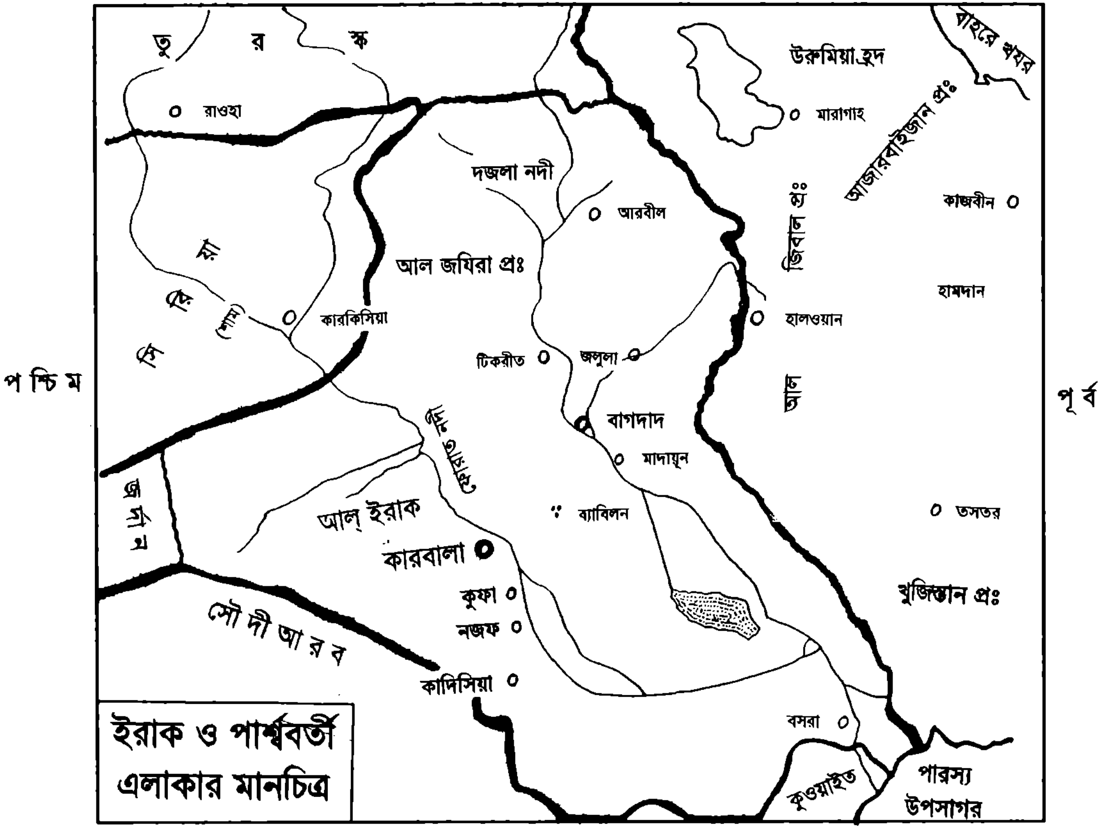

www.pathagar.com

স্পেন বিজয়

ভূমিকাঃ

ব্যাটল অব ইসলাম নামক এ গ্রন্থের সর্বশেষ যুদ্ধের বর্ণনা এটি। ইতোপূর্বে ইসলামের এই যুদ্ধগুলো নিয়ে যে আলোচনার চেষ্টা করা হল, সেগুলো মহানবী (সা.) এর সময় থেকে নিয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনদের আমলের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো পর্যন্ত। আবার এর বাইরেও আলোচনা হয়েছে। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় বদরের যুদ্ধ থেকে তাবুক পর্যন্ত ৮টি যুদ্ধ এবং ইসলামের প্রথম এবং দ্বিতীয় খলিফার আমলে ৩টি যুদ্ধ। এর বাইরে বর্ণনা করা হয়েছে কারবালার যুদ্ধ। গ্রন্থের শেষ যুদ্ধটি মুসলমানদের আরেকটি অন্যতম গৌরবজনক অভিযান স্পেন বিজয় সম্পর্কে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনরা বিজয় অর্জন করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সংস্পর্শে ছিলেন। কিন্তু তারপরে যেসব বিজয় অর্জন হয়েছিল সে বিজয়গুলো কারা অর্জন করেছিলেন? এগুলো বিজয় করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শে তৈরি হওয়া মুসলিম বীর সেনাবাহিনীরা। রাসূল (সা.) এর সময়ের যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের সাহায্য নিয়েছি। পরবর্তী যুদ্ধগুলোর বর্ণনা করতে গিয়ে সাহায্য নিতে হয়েছে ইতিহাসের। স্পেন বিজয়টিও আলোচনা হবে ইতিহাসের ভিত্তিতেই। মুসলমানরা কিভাবে স্পেন বিজয় করেছিল, কিভাবে শাসন করেছিল, কতদিন শাসন করেছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে এ অধ্যায়ে। এ বিষয়গুলো যারা ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র কিংবা শিক্ষক, তারা জানেন। কিন্তু যারা জানেন না, তারাও যেন একটু জানতে পারেন, আজকের অবহেলিত মুসলিম জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে, গর্বিত ইতিহাস সম্পর্কে সে উদ্দেশ্যেই এ লেখা।

স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাসঃ

মহানবী (সা.) এর তিরোধানের পর মুসলমানদের ক্রমাগত ও অভূতপূর্ব বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সামরিক শৌর্য এবং ধর্মীয় আবেদনে মুসলিম শক্তি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ ভূখণ্ডে এক নূতন যুগের সূচনা করে। তাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস, নীলনদ ও ভূমধ্যসাগর উপকূলে প্রাচীণ রোম ও পারস্য শক্তির অবসান ঘটিয়ে জ্যোতির্ময় ইসলামী প্রভায় গড়ে তুলে নতুন শাসন ও

www.pathagar.com

সভ্যতা। মুসলিম বাহিনী যেদিকে অভিযান পরিচালনা করেছে সেদিকেই বিজয় অর্জন করেছে। যে ঘটনা সকলের মধ্যেই কৌতূহলের সৃষ্টি করে। মুসলিম বাহিনী সমস্ত উত্তর আফ্রিকা বিজয় করে দুর্বার গতিতে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালী অতিক্রম করে ইউরোপে প্রবেশ করে। সেখানে খুব দ্রুত গতিতে স্পেন অধিকার করে আর ইউরোপের স্পেন গড়ে উঠে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির এক আদর্শ স্থানে। খৃষ্টান ইউরোপ মুসলিম স্পেনের সংস্পর্শে এসে ঘোর অন্ধকার ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে টেনে তোলে। অর্ধসভ্য ইউরোপে প্রবাহিত হয় মুসলিম সভ্যতা। **কর্দোবা, গ্রানাদ, তলেদো, সেভিল, মালাগা** প্রভৃতি দেশ থেকে বিদ্যার্থীগণ দলে দলে এসে সমবেত হয়। তারা জ্ঞান সূর্যের আলোকে স্নাত হয়ে ইউরোপের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটায়। আরবীয় মুসলমানদের এই অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন যে, মধ্যযুগের প্রথম ভাগে এই আরব জাতি মানব সভ্যতার প্রগতির ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে, এমন আর কোনো জাতি রাখেনি। শার্লামেন ও তার লর্ডরা যখন কেবল নাম দস্তখত করতে শিখছিলেন তখন কর্দোবার বিজ্ঞানীরা সতেরটি বিরাট লাইব্রেরী নিয়ে গবেষণায় মগ্ন। যার একটি লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ।

বিজয়ের পূর্বাভাসঃ

ইসলামের পতাকা নিয়ে মুসলিম বাহিনী প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন এবং সফল হলেন। সেখানে প্রখ্যাত সেনাপতি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন সেনাপতি মুসা বিন নুসাইয়ের। দামেস্কের খলিফা আল-ওয়ালিদের নির্দেশক্রমে সেনাপতি মুসা উত্তর আফ্রিকায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তখন পর্যন্ত রোমানদের প্ররোচনায় অসংখ্য বার্বার গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধাচারণে মগ্ন। তাই সেনাপতি মুসা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বার্বারদেরকে রোমানদের প্রভাব মুক্ত করে ইসলামের সুমহান বাণীতে উদ্বুদ্ধ করে আরবীয়দের সাথে ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। এই সামরিক শক্তি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে মুসলিম শাসন নিয়ে আসেন। অতঃপর তারা দৃষ্টি দিলেন আফ্রিকার অপর তীরে স্পেনের দিকে।

বিজয়ের পূর্বে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থাঃ

এই যুগে স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল বড়ই করুণ এবং হৃদয়বিদারক। এখানে শাসক আর শাসিতের মধ্যে ব্যবধান ছিল যোজন যোজন দূরত্বে। সম্পর্ক ছিল প্রভু আর ভৃত্যের। খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তাদের আস্থা, অনুরাগ আর ধর্মযাজকদেরকে মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারটা তাদের মধ্যে ছিল ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ছিল নিছক নিজেদের স্বার্থ

www.pathagar.com

রক্ষার জন্য অথবা নিজেদের অপকর্ম ঢেকে রাখার জন্য। পরধর্মকে উচ্ছেদ করাকে গথ শাসকরা তাদের ধর্মের কাজ বলে মনে করতেন। এজন্য তারা বহু ইহুদীকে জোরপূর্বক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। রাজা, অমার্তবর্গ, জোতদার জমিদার ও সামন্তরাজদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে স্পেনের অভিজাত শ্রেণী। তারা জীবনকে উপভোগ করতো মদ, জুয়া, শিকার, ভুরিভোজ ইত্যাদির মাধ্যমে। ভূমিদাস বা কৃতদাসরা ছিল সর্বনিম্ন শ্রেণীর মানুষ। তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ ছিল না। সারাজীবন মনিবের হুকুম মেনে চলার জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে হতো। মানুষের যে ন্যূনতম চাহিদা সেটা ভাবাও ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। মনিবদের নির্দেশেই বিয়ে করারও হুকুম ছিল না। মানবতার প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ স্পেনের শোষিত, বঞ্চিত ও হতভাগ্য মানুষদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এছাড়া সে সময় স্পেনের রাজনৈতিক আকাশও ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে প্রদেশগুলোর প্রতি তাদের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। মোট কথা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আফ্রিকা যখন মুসলমানদের শাসনাধীনে থেকে সহনশীল ও ন্যায়বিচারের আশীর্বাদ ভোগ করছে, তখন পার্শ্ববর্তী স্পেন উপদ্বীপ গথদের পদতলে পড়ে আর্তনাত করছিল। এসব কারণে সুবিধা বঞ্চিত সাধারণ মানুষ কামনা করছিল যে কিভাবে তারা এই যন্ত্রণা থেকে, এই শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করবে? বা কে তাদেরকে এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবে? তাদের এই সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক দুর্গতি, ধর্মীয় কলুষতা এবং সামরিক শক্তির দুর্বলতার কারণে উত্তর আফ্রিকা থেকে মুসলমানরা স্পেন আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

স্পেন অভিযানঃ

সে সময় উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা খ্যাতিমান মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর পার্শ্ববর্তী স্পেনের সামগ্রিক অবস্থার সংবাদ রাখতেন। স্পেনের শাসনকর্তা রডারিকের শাসন ব্যবস্থা এবং তার সামরিক শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে তিনি অবগত হতেন। কারণ ওখান থেকে অনেক মজলুম দাস-দাসী এবং ইহুদী পালিয়ে এসে আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করতো। তারাও মুসলিম সেনাপতিকে স্পেন জয় করার অনুরোধ জানান। স্পেনের আলজিসিরাসের গভর্ণর ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান। তিনিও তার মেয়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করার কারণে রডারিকের উপর ক্ষুব্ধ হন এবং মুসলমানগণ স্পেন আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলে জুলিয়ানও গোপনে মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি নেন।

প্রথম ওয়ালিদের অনুমোদন সাপেক্ষে সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর স্পেনের প্রাথমিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু সৈন্য এবং কিছু অশ্বারোহী বাহিনীসহ ৭১১

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দে স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে পাঠান। পর্যবেক্ষণ বিবরণী ভালো পাওয়ার প্রেক্ষিতে সেনাপতি মুসার অন্যতম পারদর্শী সহকারী সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদকে সেখানে পাঠালেন। প্রাথমিকভাবে সেখানে সৈন্য সংখ্যা ছিল সাত হাজার। পরবর্তীতে সৈন্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজার এবং সর্বশেষ বারো হাজারে পৌঁছায়। যথাসময়ে সেনাপতি তারিক ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য এলাকায় অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণের স্থানটি আজও জাবালু তারিক নামে স্মৃতি বহন করছে। তবে ইংরেজদের ভাষায় জাবালু তারিক আজ জিব্রালটা নামে অভিহিত হচ্ছে। তিনি এই স্থানটিকে ঘাঁটি হিসেবে সুরক্ষিত করে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। তারা কারতিয়া অঞ্চল অধিকার করে জিব্রালটার উপকূল দিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। স্পেনের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের গভর্ণর থিয়োডমির এই সংবাদে বিচলিত হয়ে রাজা রডারিকের কাছে মুসলিম বাহিনীর অভিযানের সংবাদ পাঠান। রাজা রডারিক এ সময় উত্তর অঞ্চলে একটা বিক্ষোভ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি সামন্তরাজাদের বা প্রধানদের তাদের সৈন্য বাহিনী একত্রিত করার নির্দেশ দেন। রডারিকের অধীনে নিজস্ব বিশাল সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে সামন্তদের সেনাবাহিনীসহ সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ। রাজা রডারিকের নেতৃত্বে এই এক লক্ষ সৈন্য মুসলিম সেনাপতি তারিকের নেতৃত্বে বারো হাজার সৈন্যর মুখোমুখি হল ওয়াদি-লাক্কেন (আনন্দের নদী) নদীর তীরে। এই অসম বাহিনী পরস্পরের শক্তি পরীক্ষায় সম্মুখীন হল। তবে রাজা রডারিকের সৈন্য সংখ্যা বেশি হলেও আদর্শের দিক দিয়ে বা মনোবলের দিক দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরাই এগিয়ে ছিল বলা যায়। কারণ একদিকে সত্যের সৈনিক, ঈমানের বলে উদ্দীপ্ত, বিজয়ে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী এবং নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী বাহিনী, অন্যদিকে জোরপূর্বক সংগৃহীত ক্রীতদাস সৈন্যের দল। এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেনাপতি তারিক অল্প কথার মধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক, জ্বালাময়ী, গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্পেনের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় নেমে তিনি বললেন, হে মুসলিম বীর বাহিনী, দেখুন সামনে ইসলামের শত্রু, আর পেছনে বিশাল সাগর। খোদার শপথ! পালানোর কোনো উপায় নেই। সত্য প্রতিষ্ঠায় ও মজলুম জনগণকের রক্ষার জন্য এই জেহাদ এবং জেহাদে জয়লাভ করাই আমাদের একমাত্র রাস্তা। আপনাদের মনোবল শক্ত করুন, জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। সৈনিকরাও এই বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হল। তারাও বুঝলো যে, এখানে জয়লাভ ছাড়া আর একটি রাস্তায় কেবল তাদের জন্য খোলা আছে সেটি হল মৃত্যু। এজন্য তারাও জবাব দিল, জয়ী না হওয়া পর্যন্ত আমরা জেহাদ চালিয়ে যাবো। কারণ আমরা সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এরপর সাতদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলল। মুসলিম বাহিনীর প্রচ আক্রমণে সেই

www.pathagar.com

বিশাল বাহিনী এক পর্যায়ে পিছু হেঁটতে শুরু করে। রডারিকের নিজস্ব বাহিনী অবিচলভাবে আরবীয় আক্রমণের মোকাবিলা করে; কিন্তু তারিকের নিজের পরিচালনায় শেষ প্রত্যাঘাতের প্রচ তা ছিল অপ্রতিরোধ্য। এতে গথ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয় এবং রাজা রডারিক নৌকাযোগে পালিয়ে যাওয়া শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ নৌকা ডুবেই রডারিক মারা যায়। এইভাবে ক্ষুদ্র বাহিনী এক বিশাল রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করে স্পেনের ইতিহাস পরিবর্তন করে দেয়। মুসলিম সেনাপতির সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা আর সেনাবাহিনীর বিপুল বিক্রম সত্যিই ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। আর এই ঘটনা পুরো স্পেনে এত প্রভাব ফেলে যে, স্পেনবাসীরা আরবদের সামনা-সামনি হওয়ার সাহস, শক্তি বা উদ্যম হারিয়ে ফেলে। আর শত্রুপক্ষের এই পরাজয়ে সেনাপতি তারিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুরো স্পেন জয় করতে আর বেশি সময় লাগবে না। তিনি অনুভব করেন, এখন শুধু দেরি না করে সময়ের পূর্ণ সংব্যবহার করতে হবে। তিনি অভিযানের একটি নক্সা তৈরি করেন। তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করেন। এক সহকারীকে আদেশ দেন **কর্ডোভার** দিকে এগিয়ে যেতে; আরেকজন **মালাগার** দিকে অভিযান চালান, তৃতীয় জন এগিয়ে যান **গ্রানাডা** এবং **ইলভিরার** দিকে। মূল বাহিনীর প্রধান হিসেবে সেনাপতি তারিক নিজে এগিয়ে যান গথদের রাজধানী **টলেডোর** দিকে।

রাজধানী টলেডোসহ পুরো স্পেন বিজয়ঃ

মালাগা, গ্রানাডা ও কর্ডোভা অনায়াসে একের পর এক মুসলমানদের দখলে চলে আসে। তারিকের দ্রুত গতিবিধি ও আক্রমণের তীব্রতায় গথরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেউ বশ্যতা স্বীকার করেন, কেউ পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। অন্যদিকে ইহুদী, ভূমিদাস, দৈন্য-পীড়িত নাগরিকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ মুক্তিদাতা হিসেবে মুসলমানদেরকে স্বাগত জানায়, অভিবাদন জানায়। যে কারণে প্রায় বিনা বাধায় সেনাপতি তারিক রাজধানী অধিকার করেন। রাজধানী অধিকারে নেয়ার পর সেখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। ওখানকার নাগরিকদের সাথে সেনাপতি তারিক অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেন এবং তিনি দৃষ্টি দেন বিজয়ী অঞ্চলগুলোতে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি যোগ্যতা এবং পদমর্যাদা অনুসারে ওখানকার কিছু ব্যক্তিকে শাসন কাজে নিয়োগ করেন। যেমন উইটিজার পুত্র অচিলাকে মুসলিম শাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সাপেক্ষে টলেডোর গভর্ণর এবং কাউন্ট জুলিয়ানকে সিউটার গভর্ণর নিয়োগ করেন। অন্যান্য অঞ্চলে যোগ্য, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদেরকে শাসন ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি নিজে পলায়নপর গথদেরকে এসটর্গা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। এভাবেই প্রায় অর্ধেক স্পেন

www.pathagar.com

বিজয় করে খলিফা ওয়ালিদের রাজ্য সীমানা সুদূর ইউরোপ ভূখণ্ডে বিস্তৃত করেন। ইতোমধ্যে স্পেনের বাকী অংশ বিজয় অর্জনের জন্য আরেক অন্যতম সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর ১৮,০০০ লোক নিয়ে (জুন, ৭১২ খৃষ্টাব্দে) স্পেনে অবতরণ করেন। তারা উভয়ে রাজধানী টলেডোতে মিলিত হন উভয়ের বাহিনী একত্রিত হয়ে দুই বিখ্যাত অপরাজেয় সেনাপতি পুনরায় বিজয় অভিযান শুরু করেন। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করার মত শক্তি তখন স্পেনে ছিল না। তাই একের পর এক **আরাগন, সারাগোসা, তারাগোনা, বার্সিলোনা** এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য প্রধান নগরীগুলো পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের হাতে আসে এবং দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পীরেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত পুরো স্পেন চলে আসে মুসলমানদের হাতে। এমনকি কয়েক বছরের মধ্যে পতুর্গালের কিছু অংশও মুসলমানদের দখলে আসে।

মুসার আরও পরিকল্পনা এবং আংশিক বাস্তবায়নঃ

তারিককে গ্যালিসিয়া দখলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মুসা বিন নুসাইর ফ্রান্স বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি সহজেই ফ্রান্সে প্রবেশ করেন এবং ল্যাঙ্গুয়েডকের সেই অংশ দখল করে নেন, যেটা গথ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্ভীক এই সেনাপতি ফ্রান্স ও স্পেনের প্রাকৃতিক সীমারেখা পীরেনীজ পর্বতমালায় দাঁড়িয়ে পুরো ইউরোপ জয় করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই দুর্বার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য অনড় এবং বিপুল সেনাবাহিনীও সে ইচ্ছার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সে সময় পাশ্চাত্য পুরোপুরিভাবে মুসলমানদের পদানত হয়। কারণ সে সময় তাদের মধ্যে কোনোরকম সংহতি ছিল না। কিন্তু সেনাপতি মুসার এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব হয় না এবং মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির এই উজ্জ্বলতম সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় দামেসক সরকারের সাবধানী ও দ্বিধাগ্রস্থ পররাষ্ট্র নীতির জন্য। কারণ সেনাপতি যখন ইতালিতে প্রবেশের জন্য ফ্রান্সের আরও ভেতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন খলিফা ওয়ালিদ বিজয়ীদেরকে ফিরে আসার জন্য দূত মারফত সংবাদ পাঠান। তবে এটা বলতে হবে, সেনাপতি মুসা ও তারিককে ফিরিয়ে আনার পেছনে খলিফা ওয়ালিদের যে উদ্দেশ্যই থাক, ইসলামের জন্য এটি নিঃসন্দেহে দুর্দশাজনক হয়েছিল। তা নাহলে মুসলিম সাম্রাজ্য আরো অনেক বেড়ে যেত। নির্যাতিত সাধারণ মানুষ ইসলামের সুমহান নেতৃত্ব লাভ করে ইসলামের সংস্পর্শে আসতে পারতো। সেটা না হওয়াতে আরও আটশো বছর ইউরোপ থেকে যায় অন্ধকারের মধ্যেই।

সেনাপতি তারেক মুসার স্পেন ত্যাগঃ

যাহোক, দামেস্কের সংবাদের ভিত্তিতেই সেনাপতি তারিক এবং মুসা স্পেন ত্যাগ করে সিরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা স্পেনে অবস্থান করেছিলেন যথাক্রমে ৩

www.pathagar.com

বছর ৪ মাস এবং ২ বছর ৪ মাস। তবে স্পেন ত্যাগ করার আগে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেনাপতি মুসার ছেলে আব্দুল আজিজকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। যার রাজধানী হয় সেভিল। তাঁর অন্যান্য ছেলেরাও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাদেরকেও বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব দেন। অর্থাৎ নববিজিত স্পেনকে যোগ্য হাতে তুলে দিয়ে বহুসংখ্যক অনুচর বা সহযোগীসহ তাঁরা স্পেন ত্যাগ করেন।

বিজয়ের ফলঃ

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইউরোপের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এর ফলে উপদ্বীপে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। শুধু সামাজিক নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় জীবনে আনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এর ফলে যুগ-যুগান্তরের ধর্মজাযক ও অভিজাত শ্রেণীর অন্যায় ও অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় এবং সাম্যের ছকে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। শোষণ, বঞ্চনা আর জুলুমের অবসান হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার পায়। বিশেষ করে নির্যাতিত ও পদদলিত ইহুদীরা বিনা বাধায় তাদের ধর্ম পালনের অধিকার পায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বীকৃত হয়। যে করের ভারে শিল্প ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কষ্টের সীমা ছিল না, সেটা দূর হয়। কারণ পূর্বের খামখেয়ালী ও পীড়াদায়ক শুল্কের পরিবর্তে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর চালু হয়। অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে তথা নতুন এবং সুন্দর অর্থনীতির কাঠামোতে শিল্প কারখানাগুলোর অবস্থার পরিবর্তন হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়। বেকার সমস্যার সমাধান হয়, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়। সবরকম সরকারি চাকরি ও মর্যাদাপূর্ণ পদগুলো মুসলমান, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের জন্য সমানভাবেই খোলা ছিল। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল দাস ব্যবস্থার শিকার হওয়া মানুষগুলো। যারা পশুর চেয়েও অধম ব্যবহার পেয়েছিল, তারা মানুষের মর্যাদা লাভ করে। তারা বুঝতে পারে যে, মুসলমানদের আমলে তাদের পুনর্জন্ম ঘটেছে। এজন্য তাদের মধ্য থেকে অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এছাড়াও স্পেনের সকল শ্রেণীর সাধারণ জনগণ সব ধরণের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। এক কথায় স্পেন বিজয়ের ফলে ইউরোপে ধর্ম, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক নতুন যুগের অধ্যায় সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হতেই স্পেন ইউরোপের রেনেসার সূত্রপাত করে। মুসলমানদের উন্নতমানের ভাবধারা, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও নীতি স্পেনীয় জনগণের মাঝে অনুকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। মুসলমানদের অধীনে স্পেনের ব্যাপক উন্নয়ন

www.pathagar.com

ঘটে। কারণ আরব ঔপনিবেশিকরা প্রধানত কৃষিপোযোগী দেশগুলো থেকেই এসেছিল; যেমন–মিশর, সিরিয়া, পারস্য। তাদের প্রত্যেকেরই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃত্তি ছিল এবং তারা শিল্প-বাণিজ্যের দিকেও ঝুকেছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে। কারণ তারা শ্রমকে একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে স্থান দিয়েছিল। যে কারণে তাদের অসামান্য উদ্যমে স্পেনের বৈষয়িক উন্নতি ঘটাতে শুরু করে, যা এতদিন খৃষ্টানদের শাসনাধীনে নিস্ফলা হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ তাঁরা বহু কৃষি বিষয়ক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করেন, পতিত জমিগুলো উর্বরা করেন, পরিত্যক্ত নগরীগুলোকে পুনরায় জণাকীর্ণ করে সেগুলোকে সুশোভিত ও সুন্দর করেন। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় স্পেন বিজয়টি বর্তমানেও যে কোনো আধুনিক সরকারের কাছে একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

প্রাসঙ্গিক কথাঃ

পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতটির অর্থ হল ‘পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন, তিনি মানুষকে এমন সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানতো না।’

হাদীস শরীফে এসেছে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও। মক্কা থেকে চীনের দূরত্ব বেশি ছিল বলেই চীন প্রসঙ্গটি এসেছে। আসলে এটি একটি প্রতীকী শব্দ।

কুরআনের এই আয়াত এবং হাদীস মুসলমানদেরকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করে তোলে। তারা জ্ঞান অর্জন করতে শেখে, তারা লেখাপড়া করে, তারা সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। শুধু তাই না, তারা রাষ্ট্র জয় করে। যে কারণে মক্কা-মদীনার ইসলাম শুধু মক্কা-মদীনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। পৃথিবীব্যাপী সে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। স্পেন বিজয় ছাড়াও আমাদের জানার মত অনেক ইতিহাসই রয়েছে। রাসূল (সা.) এর যুগের পরে আসে খোলাফা-ই রাশিদীনদের যুগ। এরপর আসে উমাইয়া বংশ। যারা রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। উমাইয়া বংশের পতনের পর আসে আব্বাসীয় যুগ। এরপর বাগদাদে খলিফা হারুনূর রশীদের আমলে আসে মুসলমানদের স্বর্ণযুগ। ৭৮৬ থেকে ৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তেইশ বছর মুসলমানদের জন্য আরেক গৌরবজনক অধ্যায় ছিল। গৌরবজনক অধ্যায় আরো অনেকগুলোই ছিল। সব আলোচনা এ গ্রন্থে থাকছে না। আরব্যোপন্যাসের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক, বাগদাদের একচ্ছত্র অধিপতি বাদশাহ হারুনুর রশীদ ছিলেন পৃথিবীর সর্বযুগের সব দেশের প্রথম শ্রেণীর রাজা বাদশাহের সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁর রাজত্বকাল এশিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায় সংযোজন করেছে। তিনি সুদক্ষ সমরনায়ক হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হতেন।

www.pathagar.com

তিনি রাজ্যের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য নিজেই ছুটে যেতেন। তাঁর সময়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছিল, সে সময় এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। কিন্তু তিনি সব দিক দিয়ে যে উন্নতি করেছিলেন, তাঁর শাসনামলের প্রায় সাড়ে চারশো বছর পরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের আক্রমণে সে সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আবার হালাকু খান কেন আক্রমণ করলো সেটাও আমরা একটু ভাবতে পারি। কারণ বাদশাহ হারুনুর রশীদ যে শাসন চালু করে গিয়েছিলেন, পরবর্তী শাসকরা সেই শাসন ব্যবস্থা ধরে রাখতে পারেনি। যে কারণে হালাকু খান আক্রমণ করার সুযোগ পায়, আর মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। এসব ইতিহাসগুলোও আমাদের জানা প্রয়োজন যে, কেন আমরা বারবার বিজয়ী হয়েছি, প্রশংসিত হয়েছি আবার কেন আমরা পিছিয়ে পড়েছি? আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের যে অবস্থানে থাকার কথা ছিল, কেন সে অবস্থানে নেই? এগুলো আমাদের চিন্তার খোরাক জোগানের কথা।

উপসংহারঃ

সর্বশেষ আলোচনার সমাপ্তি টানবো যে, বদরের যুদ্ধ থেকে নিয়ে স্পেন বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধের মধ্যে যে বর্ণনা দেয়া হল, যে আলোচনা করা হল, তার মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে, অবশ্যই মেসেজ রয়েছে বা বার্তা রয়েছে। বার্তাগুলো আমাদেরকে যেমন অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধনেরও সুযোগ করে দেয়, আমরা যেন সেখান থেকে কিছু শিখি। আমরা যেন ইসলামকে জানি, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাগুলোকে বুঝি এবং সেই অনুযায়ী চলার চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, মহান আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে সেইভাবে চলার রাস্তাটা সহজ করে দেন। আমিন।

www.pathagar.com

পশ্চিম

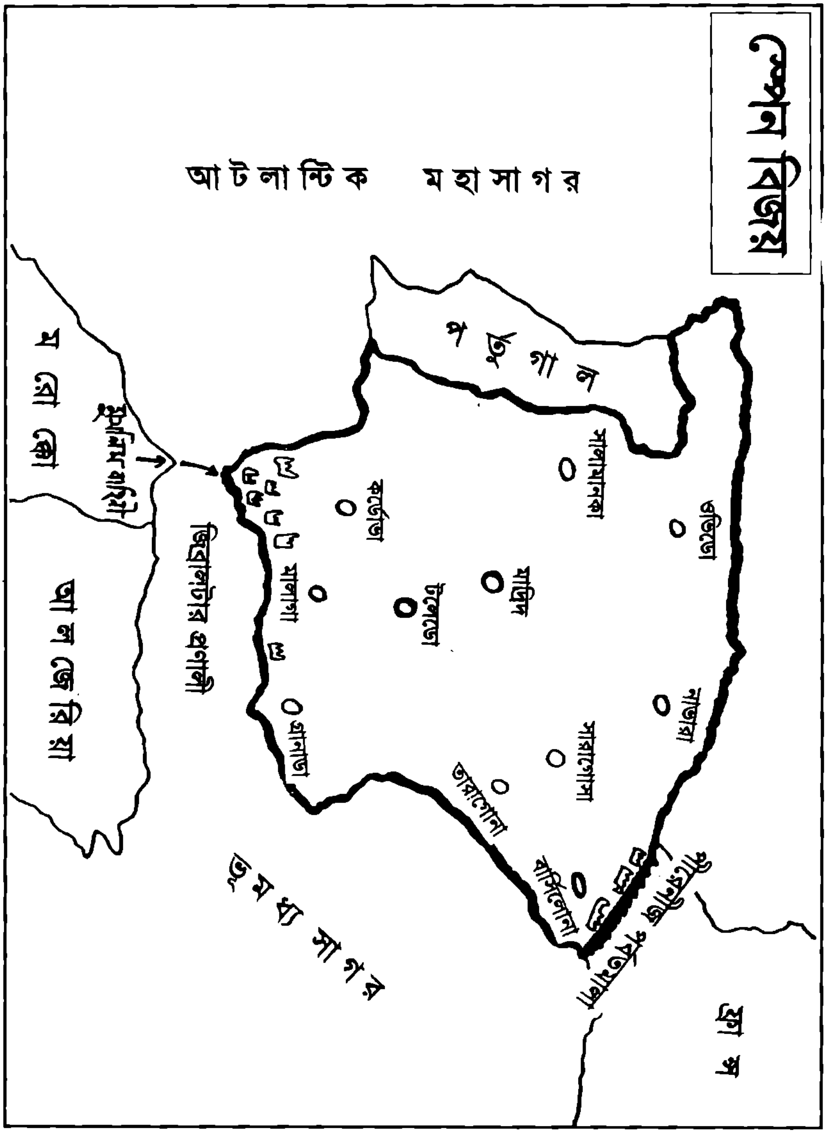

পূর্ব

www.pathagar.com

বর্ণিত আলোচনার সহায়ক গ্রন্থঃ

(১) তাফসীর ইবনে কাসীর

(২) বুখারী শরীফ

(৩) রণাঙ্গনে মহানবী
ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
অনুবাদঃ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মদ আতর আলী

(৪) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন
শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

(৫) আর রাহীকুল মাখতুম
অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী

(৬) তারীখে ইসলাম
সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান

(৭) খিলাফতে রাশেদা
মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

(৮) রক্তে ভেজা যুদ্ধের ময়দান
হাফেজ মওলানা হুসাইন বিন সোহরাব

(৯) মোহাম্মদ হিজ লাইফ বেইজড অন দি আরলিয়েস্ট সোর্সেস
মার্টিন লিঙ্গজ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৩, ১৯৮৮

(১০) দি কোরানিক কনসেপ্ট অব ওয়ার
ব্রিগেডিয়ার এস.কে.মালিক
ভারতীয় মুদ্রণকারী ও প্রকাশক, হিমালয়ান বুকস, নিউ দিল্লী

(১১) দি স্পিরিট অব ইসলাম
সৈয়দ আমির আলী

(১২) ব্যাটেলস বাই দি প্রফেট
এস আমিনুল হাসান রিজভী
প্রকাশকঃ জেনুইন পাবলিকেশন্স এন্ড মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লী

(১৩) আল কুরআনুল করীম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ
দ্বাবিংশতম মুদ্রণঃ নভেম্বর ২০০১

www.pathagar.com

কয়েকটি যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যার পার্থক্যঃ

যুদ্ধের নাম	মুসলিম সৈন্য সংখ্যা	শত্রুর সৈন্য সংখ্যা
বদর	৩১৩	১০০০
ওহুদ	১,০০০	৩,০০০
খন্দক	৩,০০০	১০,০০০
খয়বর	১,৪০০	১৪,০০০-৪,০০০
মু'তা	৩,০০০	১,০০,০০০
মক্কা বিজয়	১০,০০০	-
হুনায়েন, তায়েফ	১২,০০০	৫,০০০
তাবুক	৩০,০০০	৪০,০০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com